NEHRU
BAL PUSTAKALAYA

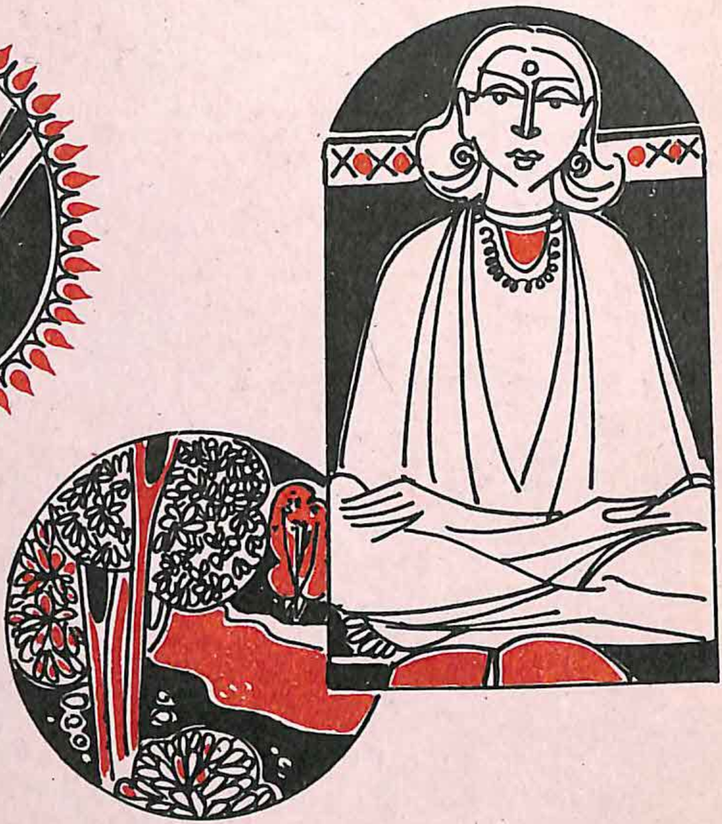
নেহরু বাল পুস্তকালয়

চিরকালের বই



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া





নেহরু বাল পুস্তকালয়—27

চিরকালের বই

লেখক : মনোজ দাস
ছবি : সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
অনুবাদ : আদিত্য সেন





ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লী

First Edition 1974 (*Saka* 1896)
Reprinted 1980 (*Saka* 1901)
Reprinted 1986 (*Saka* 1908)

BOOKS FOREVER *(Bengali)*

Published by the Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed at Saraswati Art Printers, 8247/2 New Anaj Mandi, Delhi-110006

চিরকালের বই

প্রায় দু'হাজার বছর আগে চীন দেশে এক সম্রাট ছিলেন, নাম শি হোয়াঙ তাই। তিনি এক অদ্ভুত কারণে তাঁর প্রজাদের ওপর খাপ্পা ছিলেন। প্রজারা এন্তার বই পড়ত ; যারা পড়তে জানত না, তারাও অন্যের কাছে বসে শুনত। এখন এই যে ইতিহাস, দর্শন আর উপন্যাস, রাশি রাশি এত বই লেখা হয়েছে তাতে সম্রাট বা তাঁর পিতৃপুরুষের গুণগরিমার কথা লেখা আছে কিনা শি হোয়াঙ তাই সে-বিষয়ে কি করেই-বা সুনিশ্চিত হবেন ! কিন্তু কে জানে, এও-তো হতে পারে যে কোনো কোনো লেখকের এত বড় বুকের পাটা যে সম্রাটকেই সমালোচনা করে বসেছেন।

তাই শি হোয়াঙ তাই ভাবলেন, লোকেদের বই পড়া চলবে না। যে কাজের প্রয়োজন নেই তা নিয়ে এদের এত মাথাব্যথাই বা কেন ? ওদের যা কাজ তাই করুক না : পরিশ্রম করুক, অনুগত থাকুক আর ঠিকমত ট্যাকস জমা দিক। তাহলেই তো শান্তি বজায় থাকে।

তাই সম্রাট হুকুম দিলেন, সব বই পুড়িয়ে ফেল। তখনকার দিনে ছিল কাঠের বই ; কাঠের ওপর অক্ষরগুলি খোদাই করা থাকত। ওরকম বই চট্ করে লুকিয়ে ফেলা সহজ ছিল না। সম্রাটের অনুচরেরা গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে গিয়ে তোলপাড় করে যেখানে বই খুঁজে পেল, আগুন জ্বালিয়ে দিল। সেই সময়টায় বিখ্যাত চীনের প্রাচীর তৈরী হচ্ছে। কাঠের গুঁড়ির মত মোটা মোটা বই উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল প্রাচীর তৈরীর কাজে। কাঠের

বই যখন আছে পাথরের কী দরকার! বই-পাগল পণ্ডিতরা বই হাতছাড়া করতে সম্মত না হওয়ায় তাঁদের সুদ্ধ প্রাচীরে গেঁথে দেওয়া হল।

বছরের পর বছর কেটে গেল আর সম্রাটও মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল, যেসব বই নষ্ট হয়ে গেছে বলে ভাবা হয়েছিল সেগুলির আবার আবির্ভাব ঘটেছে, এবার নতুন কাঠের টুকরোয় লেখা। সেইসব বইগুলোর মধ্যে ছিল বিখ্যাত দার্শনিক কনফুসিয়াসের রচনাবলী। বিশ্বের সর্বত্র আজও লোকেরা এইসব বই পড়ে।

বই ধ্বংস করে ফেলার এটাই একমাত্র ঘটনা নয়।

সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ও পণ্ডিত হুয়েন সাঙ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন। একদিন তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে; ছাত্র ও শিক্ষকের বদলে সেখানে চরে বেড়াচ্ছে একপাল মোষ! হুয়েন সাঙের এ স্বপ্ন সত্য হয়েছিল; বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের তিনটে বিভাগ আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল।



প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া শহরে মস্ত বড় একটা গ্রন্থাগার ছিল। নানা দেশ থেকে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি এখানে রাখা ছিল। ভারতবর্ষ সমেত বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত ছাত্র এখানে লেখাপড়া করতে আসত। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে মহামূল্যবান্ এই গ্রন্থাগারটি জবরদস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

যে হানাদার এই গ্রন্থাগারটি ধ্বংস করে তার যুক্তি ছিল অদ্ভুত। তার পবিত্র ধর্মগ্রন্থে যে কথা লেখা আছে তা যদি এই অসংখ্য বইয়ে না লেখা থাকে তবে এই বইগুলি থাকা অনুচিত, আর তার পবিত্র ধর্মগ্রন্থে যা বলা আছে তাই যদি এইসব বইতে লেখা থাকে তবে সেগুলি রেখে দেবারও কোনো প্রয়োজন নেই!





তাই দেখা যায় বারে বারে বই ধ্বংস হয়েছে কিন্তু আশ্চর্য, যে সব বই হারিয়ে গেছে বা ধ্বংস হয়েছে বলে মনে করা হয়েছিল সেগুলি হয় পুরনো আকারে আর নয়তো নতুন রূপে আবার ফিরে এসেছে। বস্তুতপক্ষে, মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, অনুভূতি, কল্পনা ও দূরদর্শিতা থেকেই বইয়ের সৃষ্টি। তাই এই ধ্বংস করে ফেলা হলেও মানুষের অন্তর্নিহিত এইসব গুণ নষ্ট হবার নয়। দ্বিতীয় শতকে বেন জোসেফ আকিবা নামে ডেনমার্কের জনৈক ধর্মযাজককে তাঁর সংকলিত জ্ঞানগর্ভ বই সমেত পুড়িয়ে মারা হয়। সেই গ্রন্থের রচয়িতার শেষ উচ্চারিত কয়েকটি কথা মনে রাখার মত : "কাগজ পুড়ে যায় কিন্তু কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ে।"

এঁরাই সেইসব মানুষ যাঁরা প্রাণের চেয়েও বইকে বেশী ভালবাসেন। তাঁরা তাঁদের প্রিয় বইগুলি অনেক ঝুঁকি মাথায় করেও যক্ষের ধনের মত সযত্নে রক্ষা করেন। ভারতের ঐতিহ্য বলে, ঈশ্বর এত বই ভালবাসেন যে, একবার যখন প্রলয়ের বন্যায় সব বই জলে ডুবে গিয়েছিল, তিনি মৎস্য রূপ ধারণ করে বেদকে উদ্ধার করেছিলেন। এমন অনেকেও আছেন যাঁরা তাঁদের প্রিয় বই হারিয়ে গেলে বিচলিত হন না কারণ পুরো বইটাই তাঁদের কণ্ঠস্থ।

প্রাচীন যুগে লোকেদের বই কণ্ঠস্থ করার অসীম ক্ষমতা ছিল। খৃষ্ট জন্মের নয় শত বছর আগে বিখ্যাত গ্রীক কবি হোমার দুটো মহাকাব্য লেখেন, ইলিয়াড ও ওডিসি। পেশাদার চারণ কবিরা বংশ পরম্পরায় এই দুটো মহাকাব্য আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। দুটো মহাকাব্যে রয়েছে মোট 28 হাজার পংক্তি। কোন কোন চারণ কবি এর চার গুণ পংক্তি মুখস্থ করতে পারতেন।

এই স্মরণশক্তির প্রসঙ্গে প্রথমেই বেদের কথা মনে পড়ে। বেদ, ভারতের তো বটেই, কারো কারো মতে, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। বহু কাল বেদের শ্লোকগুলি লিখে রাখা হয়নি ; গুরু থেকে শিষ্যে, পিতা থেকে পুত্রে তা মুখে মুখে চলে এসেছে।

সংস্কৃত ভাষায় পুরনো রীতিতে বেদ রচিত। ভারতবর্ষে বরাবরই বিভিন্ন

ভাষার প্রচলন ছিল ; তবুও প্রাচীন ভারতের সর্বত্র ছিল সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার। ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের কবি ও পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছেন।

প্রাচীন ভারতের দর্শন ও বিজ্ঞান দূর দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে



পড়েছিল। ভারতের কথাকাহিনীর বিরাট ভাণ্ডার থেকে কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র আর জাতকের গল্পের মত অসংখ্য মণিমাণিক্যের টুকরো সেই সঙ্গে হিমালয় পেরিয়ে ওধারে বা সাগর পেরিয়ে দূর-দূরান্তের দেশে পাড়ি দিয়েছে। একথা আজ সকলেরই জানা যে, বাইবেলের অনেক নীতিগর্ভ রূপক, গ্রীস দেশীয় ঈশপের নীতিকথার গল্পগুলি, জার্মানীর গ্রীমভাইদের সংগৃহীত রূপকথার গল্প, এবং ডেনমার্কের হ্যানস্ এণ্ডারসন যেসব গল্প আবার নতুন করে বলেছেন—এসবের মূল উৎস ভারত।

ভারতের সাহিত্যের অতীত ইতিহাস প্রকৃতই সমৃদ্ধ। এই সুবৃহৎ বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল সাজানো বাগানকে দেখবার জন্য ছোট্ট একটি জানলার মতই এই বইখানি। এখানে আমরা মাত্র কয়েকটি বইয়ের কথাই বলব। তোমরা বড় হলে গীতা, যোগাবশিষ্ঠ, ত্রিপিটক, ধর্মপদ, গ্রন্থসাহেব এবং জ্ঞানেশ্বরী-র মতো আরো কত কত বই পড়বে, জানবে এবং উপভোগ করবে।

বেদ

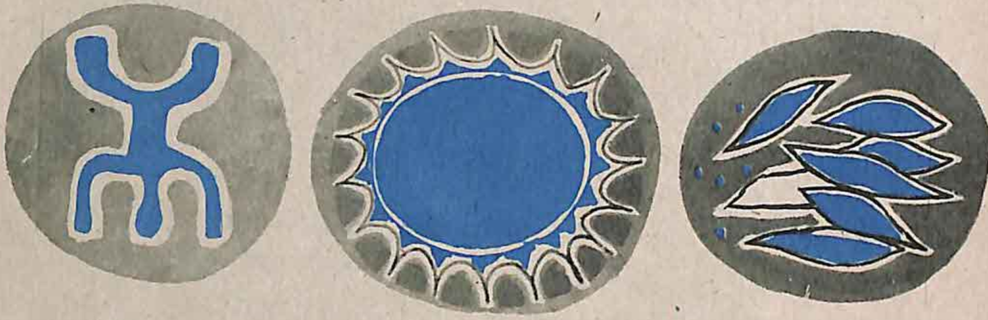
সবার উপরে যে সত্তা আছে মানুষ তা বুঝতে চেয়েছে—ঈশ্বর, ভূমানন্দ, পরম সত্য কী—এবং এসব প্রশ্নের কী সমাধানে মানুষ উপনীত হয়েছে, এই হল বেদের প্রধান বিষয়বস্তু।

বহুকাল থেকে বেদ বলতে লোকেরা বুঝত শ্রুতি। সাধারণ অর্থে শ্রুতি বলতে বোঝায়, যা আমরা শুনি ; কিন্তু এর গূঢ় অর্থ হল ঈশ্বরের মুখ থেকে প্রকাশিত সত্য। লোকে বিশ্বাস করত, ঋষিরা যখন ধ্যানে বসতেন তখন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁদের কাছে বেদের বাণী উদ্ভাসিত করতেন। কয়েকজন বৈদিক ঋষি—যেমন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, পরাশর, কণ্ব, মধুচ্ছন্দ—এঁদের কথা পুরাণ, লোককথা এবং প্রাচীনকালের কাহিনীতে এতবার বলা হয়েছে যে, এই নামগুলির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেছে। তাছাড়া, এই সব ঋষিই বেশীর ভাগ ভারতীয় পরিবারের বংশের আদিপুরুষ। তাই বেদ রচয়িতাদের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক।

বৈদিক ঋষিরা বিশ্বাস করতেন, মানুষের আছে শরীর, মন ছাড়াও একটি অন্তরপুরুষ আছে যার নাম 'আত্মা'। আত্মাকে জানতে পারলে নিজেকে সত্যভাবে জানা যায়। এই অর্থে নিজেকে জেনে মানুষ হয় ঋষি বা সত্যদ্রষ্টা। তারপর ইচ্ছা করলে তিনি অন্যকেও এই জ্ঞান লাভে সাহায্য করেন। কয়েকজন শিষ্য ঋষির পদতলে বসে প্রতিদিন বহুক্ষণ বেদের শ্লোকগুলি বার বার আবৃত্তি করে যেত এবং ঋষিরা এভাবে তাদের শিক্ষা দিতেন।

বেদ কোন ধর্ম বা মতবাদকে প্রচার করে না। ঋষিদের অন্তর্লোকের অভিজ্ঞতা নিয়েই বেদ রচিত। দূরের কোন জায়গায় বেড়াতে গেলে বা পাহাড়-পর্বতে চড়তে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় তা যেভাবে আমরা বর্ণনা করি, ঋষিদের অভিজ্ঞতা কিন্তু সেভাবে বলা হয়নি। ধ্যানে ঋষিরা যা উপলব্ধি করেছেন, তা এতই সুগভীর যে সাধারণ কথা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তাই তাঁরা 'রূপক ভাষা' ব্যবহার করেন। অর্থাৎ বেদে যেসব কথা আছে তা পড়ে আপাতঃদৃষ্টিতে আমরা যা বুঝি, সেগুলি তলিয়ে দেখলে তার অনেক গভীর অর্থ বেরোয়।

ছুটি উদাহরণ দিচ্ছি : 'উষা'-র অর্থ ভোর। কিন্তু বেদে এই শব্দের অর্থ



দেবী, সেই দেবী যিনি মানুষের মেঘাচ্ছন্ন মনে স্বর্গীয় আলো নিয়ে আসেন। তেমনি অন্য একটি শব্দ 'অগ্নি' অর্থাৎ আগুন। বৈদিক মতে এই শব্দের অর্থ শুধু আগুন নয় ; অগ্নি শুধু গ্রাস করে না বা পবিত্র করে না ; অগ্নি শক্তি ও সত্যের পথে এগিয়ে দেবার দ্যোতক।

মহান্ ঋষি কবি ব্যাসদেব বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছেন : ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। এই শ্লোকগুলিতে আছে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রশংসা, আছে গদ্যে রচিত বিভিন্ন যজ্ঞ-পূজা ও অনুষ্ঠানের রীতিনীতির বর্ণনা এবং দর্শনতত্ত্ব। এতে গভীর বিমূর্ত চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা যায়।

কোন সময়ে বেদ রচিত হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার নানা

রকম চেষ্টা হয়েছে। এর কোন উত্তর সঠিক তা বলা শক্ত। বহু পণ্ডিত মনে করেন, বেদ রচিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব 2500 বছর আগে। আবার বন্-এর এইচ. জেকবি এবং লোকমান্য তিলকের মতো অনেকে মনে করেন যে, এগুলি লেখা হয়েছিল 6 হাজার বছর আগে। বেদে গ্রহ-নক্ষত্রের



অবস্থানের বিষয়ে যেসব কথা লেখা আছে তা অনুশীলন করে তিলক এই সিদ্ধান্তে আসেন। অন্য একজন বিদুষী ম্যাদাম ব্লাভাৎস্কি বলেছেন, বেদে গ্রহ-নক্ষত্রের যে অবস্থানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, প্রত্যেক 6 হাজার বছরে সেই অবস্থানের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সুতরাং 60 হাজার বছর আগে বেদ লেখা হয়নি তারই-বা প্রমাণ কী ? তাঁর নিজের মত এই যে, এগুলি সুদূর অতীতে লেখা হয়েছিল।

ভারতীয় ঐতিহ্য বলে, বিজ্ঞান মানবজাতির বয়স সম্বন্ধে আমাদের যা বোঝাতে চেয়েছে, মানুষের বয়স তার চেয়ে অনেক বেশী। পুরাণ বলে, কোন এক সময়ে ভীষণ একটা প্লাবনে সকল জীবজন্তু এবং সৃষ্টি ডুবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিষ্ণু জলের মধ্যে প্রবেশ করে বেদগুলিকে উদ্ধার করেন।



এই লোককথা থেকে আমরা কি এই আভাস পাই না যে সুদূর অতীতে যে একটা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, বেদ তারই প্রামাণিক চিহ্ন ?

বেদ লিপিবদ্ধ হবার আগে বহুকাল ধরে লোকের মুখে মুখে এক যুগ থেকে অন্য যুগে আবৃত্ত হয়ে আসছে। যে-ভাষায় বেদ রচিত তা খুবই সমৃদ্ধ ; অল্প কথায় অনেক বেশী ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম। বহুকাল ধরে চর্চা না হয়ে থাকলে ভাষায় এত পূর্ণতা আসতে পারে না। বিরাট এক সভ্যতা গড়ে উঠলেই ভাষার এতটা বিকাশ সম্ভব।

যে সভ্যতা বেদের মত মহৎ সৃষ্টি সম্ভবপর করেছিল, সেই সভ্যতার বিষয়ে আমরা ভবিষ্যতে নিশ্চয় আরও অনেক কিছু জানতে পারব এবং বেদ স্তোত্রের মর্মার্থ আমাদের কাছে আরও সহজবোধ্য হবে। কারণ বেদে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন মুনি-ঋষির মত জ্ঞান অর্জন করবে, তখনই শুধু বেদের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে।



উপনিষদ

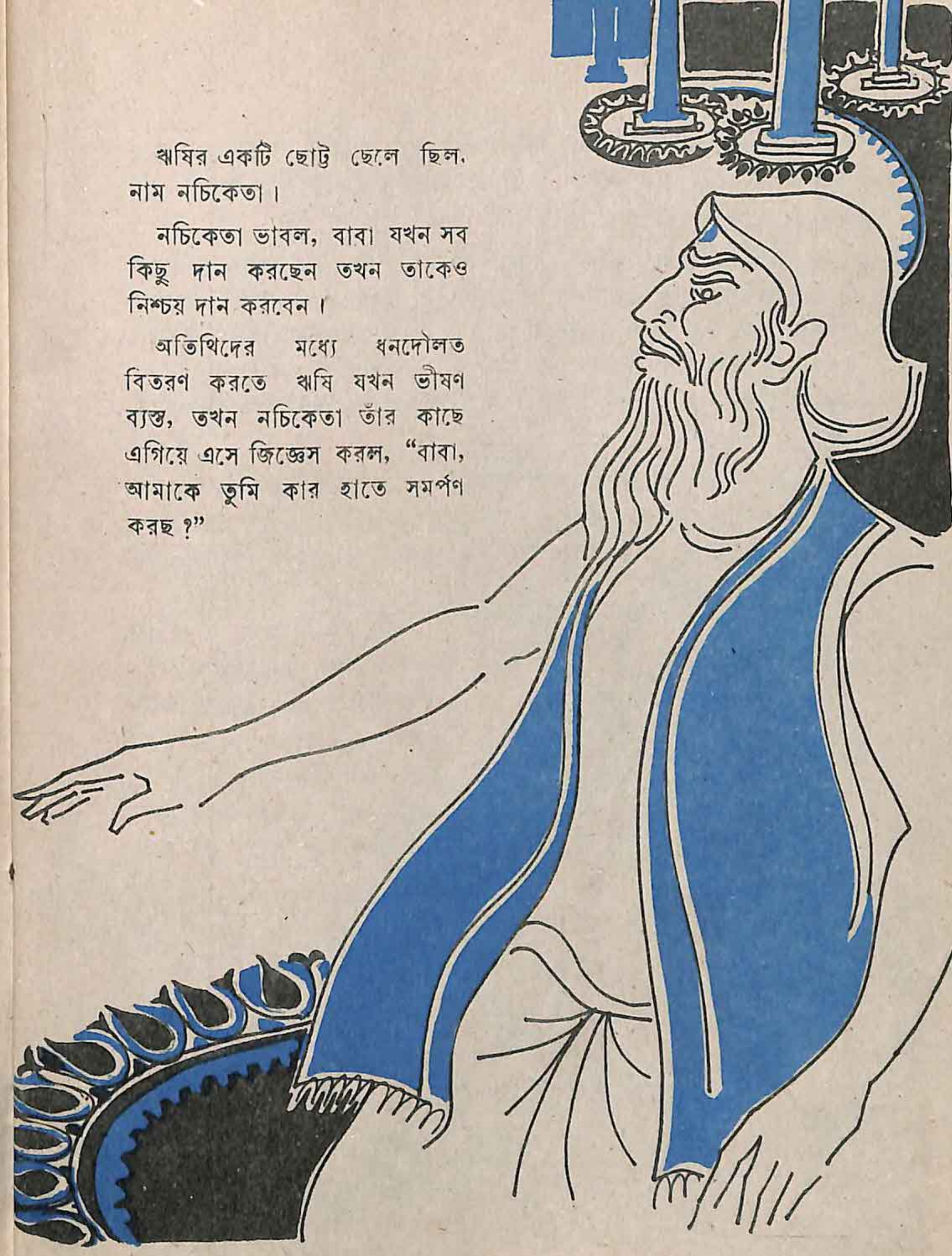
প্রাচীনকালে বাজশ্রবা নামে এক মহান্ ঋষি একটি অসাধারণ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই যজ্ঞবিধির এমন নিয়ম যে হোতাকে তার সব ঐশ্বর্য, সব ধনসম্পত্তি পুরোহিত, গরীব ও অন্যান্য যোগ্য লোকেদের দান করতে হয়।



ঋষির একটি ছোট্ট ছেলে ছিল, নাম নচিকেতা।

নচিকেতা ভাবল, বাবা যখন সব কিছু দান করছেন তখন তাকেও নিশ্চয় দান করবেন।

অতিথিদের মধ্যে ধনদৌলত বিতরণ করতে ঋষি যখন ভীষণ ব্যস্ত, তখন নচিকেতা তাঁর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, “বাবা, আমাকে তুমি কার হাতে সমর্পণ করছ?”



ঋষি কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর ছেলে বার বার একই প্রশ্ন করে যেতে লাগল। শেষে বিরক্ত হয়ে ঋষি ক্রোধে ফেটে পড়লেন—"আমি তোমাকে যমের হাতে সমর্পণ করেছি।"

যম বিভীষিকাময় মৃত্যুর দেবতা। ঋষির কথা শুনে উপস্থিত সবাই নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নিজের মুখ দিয়ে এমন কথাটা বেরিয়ে যাওয়ায় ঋষি নিজেও কম হতবাক হননি। কিন্তু নচিকেতা একটুও বিচলিত হল না ; ভাবল, "আমি এমন কিছু করিনি যাতে বাবা আমার মৃত্যুর কামনা করতে পারেন। যমের সঙ্গে আমি দেখা করি হয়তো এই আমার ভাগ্যের লিখন।"

নচিকেতা যমের রাজ্যে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। ঋষি ও অন্য অভ্যাগতরা তার মন পরিবর্তনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করলেন। কিন্তু নচিকেতা টলল না, বলল, "আমি যমরাজের সঙ্গে দেখা করবই।" এ কথা বলে সে রওনা হয়ে গেল।

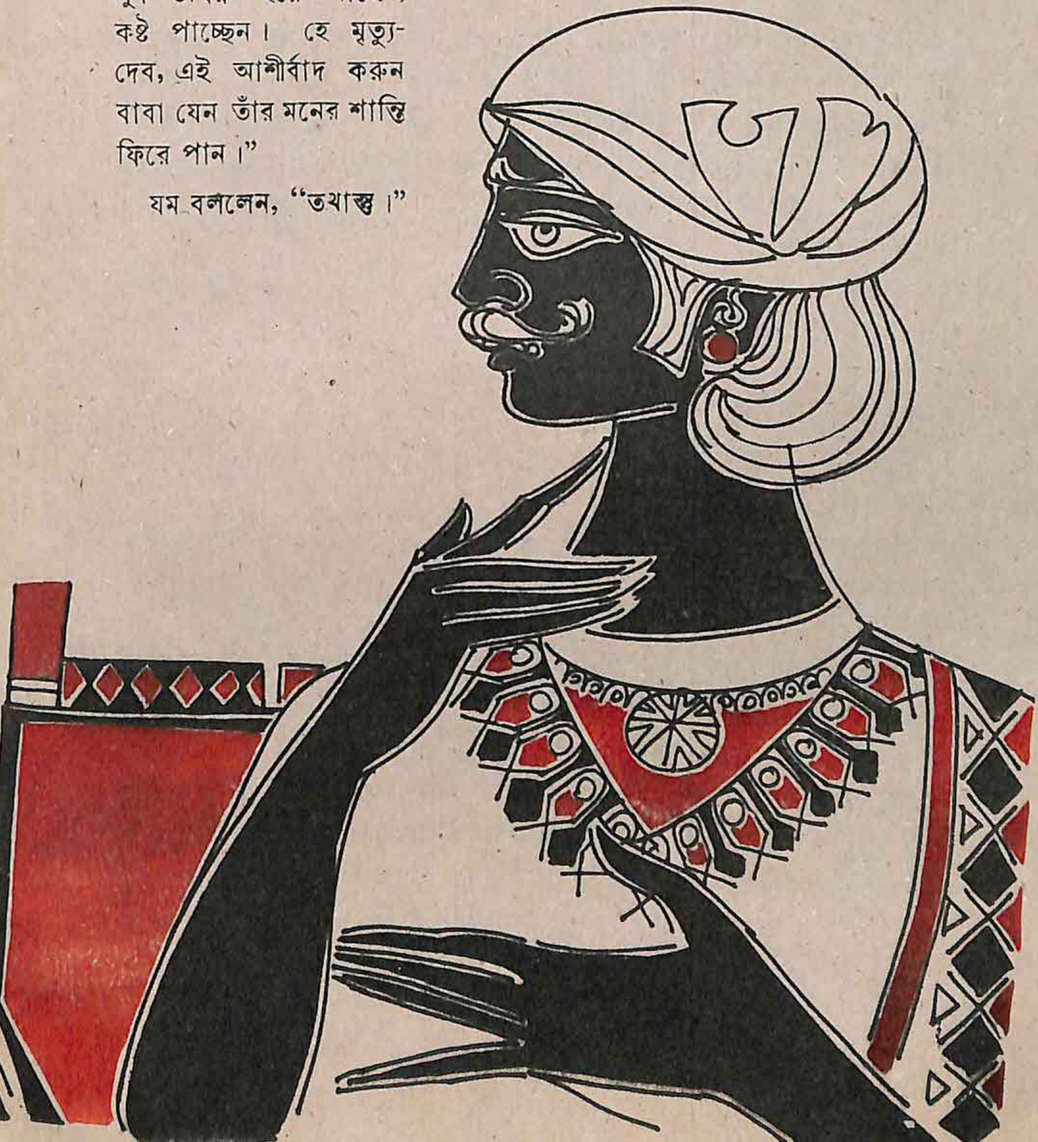


নচিকেতা যমের দরবারে পৌঁছে দেখল যম সেখানে নেই। তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল ; না জুটল খাবার; না এক ফোঁটা জল। যম ফিরে এসে ছেলেটির সাহস ও দৃঢ়সঙ্কল্পের

পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, "তিন দিন ধরে তুমি নীরবে আমার জন্য প্রতীক্ষা করে কত কষ্ট পেয়েছ। তোমাকে আমি তিনটি বর দিতে চাই। তুমি কী বর নিতে চাও বল।"

নচিকেতা বলল, "আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবার পরে বাবা নিশ্চয় খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন, কষ্ট পাচ্ছেন। হে মৃত্যু-দেব, এই আশীর্বাদ করুন বাবা যেন তাঁর মনের শান্তি ফিরে পান।"

যম বললেন, "তথাস্তু।"



নচিকেতা জানতে চাইল, যেখানে বার্দ্ধক্যের ভয় নেই বা মৃত্যু নেই, সেই স্বর্গে যাবার গোপন রহস্য কী ? যম সানন্দে তাকে সেকথা বললেন।

পরিশেষে নচিকেতা বলল, "হে চিররহস্য মৃত্যুর দেবতা, আমাকে বলুন, মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায় ? কী করে বা মানুষ অমরত্ব লাভ করে ?"

যম মহা মুশকিলে পড়লেন। এসব তো অতি গোপন কথা। একমাত্র সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ও যম নিজে ছাড়া এ গুহ্য তত্ত্ব কেউ জানে না। তাই যম নচিকেতাকে অন্য কোনো বর চাইতে বললেন—"ধনদৌলত, ক্ষমতা বা রাজ্য, যে-কোন একটা তুমি চাও।" কিন্তু নচিকেতা কোনরকম প্রলোভনে ভুলবার পাত্র নয়। তাকে মৃত্যুর রহস্য জানতে হবে। মানুষের অমরত্বের গোপন তত্ত্ব জানতে হবে।

এই মহতী বিষয় জানার নচিকেতার এত প্রবল আগ্রহ দেখে যম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁকে নচিকেতার প্রশ্নের জবাব দিতেই হল। তিনি ছেলেটিকে শেখালেন, নিজের সত্তাকে জানা, আত্মাকে জানা খুব শক্ত কাজ। সে যদি তার নিজের সত্তার প্রকৃত পরিচয় পায় তবে উপলব্ধি করবে মৃত্যু বলে কিছু নেই ; সবই মায়া, কারণ মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা, তার কখনও মৃত্যু হয় না।

নচিকেতার কাহিনী উপনিষদের অন্যতম আখ্যান বস্তু। উপনিষদের পাতায় পাতায় আমরা এই সব বহুদিন-বিস্মৃত অপ্রতিহত তরুণ সত্য-সন্ধানীদের কথা জানতে পারি।

উপনিষদের কাহিনী থেকে আমরা সেই অসাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা জানতে পারি, যা বহুকাল আগে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। শিষ্য সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত হয়ে অরণ্যে, গুরুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকত। একাগ্র মনে সে শুধু অধ্যয়ন করে যেত। শুধু যে শাস্ত্র পড়ত তাই নয়, শিক্ষার অঙ্গ ছিল ধ্যান, যোগাভ্যাস ও দুরূহ কায়িক পরিশ্রম।

ভারতের সাহিত্য সম্পদের মধ্যে বেদের পরেই উপনিষদের গুরুত্বপূর্ণ

স্থান। বহু জ্ঞানীগুণী মনে করেন যে, উপনিষদ বেদের একটা অঙ্গ, কারণ একে বলা হয় বেদান্ত, অর্থাৎ বেদের পরিণতি। কিন্তু সম্ভবত বেদের চিন্তাধারার ব্যাখ্যান হিসাবে উপনিষদকে বর্ণনা করা বেশী যুক্তিযুক্ত। প্রত্যেকটি উপনিষদের বিষয়বস্তু কোনো না কোনো বেদের সঙ্গে যুক্ত। উপনিষদগুলির বেশীর ভাগ রচিত হয়েছে বৈদিক যুগের শেষের দিকে; তার মধ্যে অল্প কয়েকটা লেখা হয়েছিল অনেক পরে। 108টি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এবং প্রশ্ন উপনিষদ।

"নিজেকে জান", এই হল মোটামুটি উপনিষদ ও বেদের বাণী। কিন্তু নিজেকে জানা খুবই শক্ত কথা তাই উপনিষদ বলেন:

"আত্মার বিষয় শোনা অনেকের ভাগ্যে নেই। অনেকে আবার শুনেও বুঝতে পারেন না। আত্মার কথা যিনি বলেন তিনি মহৎ। আত্মার কথা যিনি বুদ্ধিগোচর করতে পারেন, তিনি বিজ্ঞ। নিপুণ আচার্যের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে যাঁরা আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন তাঁরাই ধন্য।"

উপনিষদের স্রষ্টাদের চেয়ে এ শিক্ষা ভালভাবে আর কেই-বা দিতে পারেন? নির্ভীক ও স্পষ্টভাবে তাঁরা এ গোপন তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একবার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনকের সঙ্গে দর্শনতত্ত্বের আলোচনা করছিলেন। সংসারী মানুষ হয়েও জনক রাজা মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন। রাজার কথা শুনে খুশি হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে একটি বর দিতে চাইলেন।

রাজা সারা জীবন ধরে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, তা নিয়ে ভেবেছেন, অনুশীলন করেছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটেনি। আরও জ্ঞান অর্জন করতে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তিনি ঋষিকে অনুরোধ করলেন।

রাজা বললেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, মানুষের প্রকৃত আলো কী?"

যাজ্ঞবল্ক্য জবাব দিলেন, "হে রাজা, প্রকৃত আলো সূর্য। কারণ এ আলোতে মানুষ দেখে, কাজ করে এবং ঘরে ফেরে।"

জনক বললেন, "সত্যিই তাই, যাজ্ঞবল্ক্য। কিন্তু সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোন্‌টা মানুষের আলো ?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "চাঁদ তখন তার আলো, কারণ চাঁদের আলোতে মানুষ দেখে, কাজ করে আর ঘরে ফিরতে পারে।"

জনক বৈদেহী বললেন, "হ্যাঁ, তাই বটে, যাজ্ঞবল্ক্য। কিন্তু সূর্য যখন অস্ত যায় এবং চাঁদের আলো যখন থাকে না, তখন মানুষের কোন্‌টা আলো ?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "আগুন তখন আলো। কারণ, আগুনের আলোকে মানুষ দেখে, কাজ করে এবং ঘরে ফেরে।"

জনক বৈদেহী বললেন, "তাও বটে, যাজ্ঞবল্ক্য। কিন্তু সূর্য যখন অস্ত যায় আর চাঁদের আলো যখন অস্তমিত এবং আগুন যখন নিঃশেষিত, তখন মানুষের কোন্‌টা আলো ?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "ভাষা তখন তার আলো। কারণ এ দিয়ে মানুষ দেখে, কাজ করে আর ঘরে ফেরে। সুতরাং হে রাজন, কেউ যখন তার নিজের হাত স্পষ্ট করে দেখতে পায় না তখন যদি কণ্ঠস্বর শোনে, তবে সে তার কাছে যেতে পারে।"



জনক বৈদেহী বললেন, "ঠিক, যাজ্ঞবল্ক্য। কিন্তু সূর্য যখন অস্ত যায়, যখন চাঁদের আলো নেই, যখন আগুন নির্বাপিত আর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ, তখন কোন্‌টা মানুষের আলো?"

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "তখন আত্মাই মানুষের আলো।"



রামায়ণ

অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থে দণ্ডকারণ্যের নাম শুনতে পাওয়া যায়। পাহাড়-পর্বত ও স্রোতস্বিনী নদী নিয়ে এই বিশাল অরণ্যভূমি এখনও বর্তমান। অবশ্য দণ্ডকারণ্য আগে ছিল অনেক বড়, গোদাবরী থেকে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত।

সুমধুর কলকল স্বরে তমসা নদী আজো বয়ে চলে। বাদামী ও সাদা রঙের নুড়ির ওপর দিয়ে ঘন অরণ্যের বুকের ভেতর দিয়ে নেচে নেচে নদী ছুটে চলেছে।

তিন হাজার বছর আগে এই নদীর ধারে এক ঋষি থাকতেন। বহু বছর ধরে তিনি কঠোর তপস্যা করেন। ধ্যানমগ্ন নিশ্চল শরীরে উইপোকা বাসা বানাতে থাকে এবং ক্রমে একটা বিরাট উইয়ের ঢিপি তাঁকে একেবারে ঢেকে ফেলে! সংস্কৃত ভাষায় উইয়ের ঢিপিকে বলে বল্মীক; বল্মীক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বলে ঋষির নাম হল বাল্মীকি।

একদিন খুব ভোরে তমসা নদীতে স্নান সেরে ঋষি কুটিরে ফিরছিলেন। তাঁর নজরে পড়ল খুব সুন্দর দুটি পাখি মনের আনন্দে মিলেমিশে খেলা করছে। বাল্মীকি এ অপরূপ দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হঠাৎ কোথা থেকে সোঁ করে ব্যাধের একটা তীর এসে একটি পাখির গায়ে বিঁধল। পাখিটা মরে গেল। দুঃখে ও ব্যথায় অন্য পাখিটা অধীর হয়ে ডাকতে লাগল।



বাল্মীকি ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। গভীর আবেগে কয়েকটি কথা বলে উঠলেন। শুধু ব্যাধকেই তিনি ধিক্কার দেননি, তাঁর এ কথাগুলো বলে দিল মানুষের আচরণ কী হওয়া উচিত।

রাগ পড়ে গেলে ঋষি দেখলেন যে-ছন্দে তিনি কথাগুলি বলেছেন তার একটা অসাধারণ শক্তি আছে। বাল্মীকি একটা বই লেখার কথা ভাবছিলেন। কয়েকদিন ধরেই তিনি একটি নতুন বিষয় নিয়ে ভাবছিলেন ; তার জন্য দরকার ছিল ভাব





প্রকাশের একটা নতুন রীতি। এখন তিনি দেখলেন তাঁর কথাগুলি যে রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল, তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে।

এইভাবে ব্যাধকে সম্বোধন করে কথা বলার মধ্যে ভাব প্রকাশের এক নতুন ধারার জন্ম নিল, কাব্যময় প্রকাশ। বাল্মীকি আমাদের প্রথম কবি, 'আদিকবি।' তিনি সংস্কৃত ভাষায় যে মহাকাব্য লিখে গেছেন সেটাই আমাদের সাহিত্যে প্রথম প্রকৃত কাব্যগ্রন্থ।

রামায়ণ সেই মহাকাব্য। ভারতের প্রত্যেক ছেলেমেয়ে কোনো না কোনো ভাবে রামায়ণের গল্প জানে। 'আমি কোনো না কোনো ভাবে' কথাটা বলছি এই কারণে যে, রামায়ণের মূল কাহিনী পড়ে যুগ যুগ ধরে বহু লোক উৎসাহিত হয়ে মহাকাব্য, কবিতা, নাটক ও গল্প লিখে গেছেন। এঁদের মধ্যে উত্তর ভারতে তুলসীদাস এবং দাক্ষিণাত্যে কামবান প্রতিভাবান কবি। এঁরা রামায়ণের নিজস্ব অনুবাদ করেন এবং ভারতের দুই প্রান্তে তা খুবই জনপ্রিয়।

প্রত্যেক অনুবাদেই অবশ্য মুল কাহিনী মোটামুটি এক। অযোধ্যার বৃদ্ধ রাজা দশরথ যুবরাজ রামকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু রাজ্যাভিষেকের ঠিক আগে দশরথের তিন রাণীর এক রাণী কৈকেয়ী রাজাকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলেন। রাজা কৈকেয়ীকে দুটি বর দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর কথা রাখবেন বলে কৈকেয়ীকে আশ্বাস দিলেন।

কৈকেয়ী তৎক্ষণাৎ দাবী করলেন যে তাঁর পুত্র ভরতকে দশরথের উত্তরাধিকারী হিসেবে বসাতে হবে এবং রাম চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যাবেন। রাজা শুনে স্তম্ভিত হয়ে



গেলেন। অন্য বর নেবার জন্য তিনি কৈকেয়ীকে অনুরোধ-উপরোধ করলেন কিন্তু কৈকেয়ী কোনো কথা শুনলেন না।

পিতা যাতে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারেন তাই রাম পত্নী সীতা ও ছোট ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যা ত্যাগ করলেন।



কিছুদিনের মধ্যেই দশরথ শোকে-দুঃখে প্রাণ হারালেন। অনিচ্ছুক বেদনাতুর ভরত রামের হয়ে অযোধ্যার শাসন ভার গ্রহণ করলেন।

সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে রাম দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করতে লাগলেন। ঋষিদের তপোবনে যেসব রাক্ষস উৎপাত করে বেড়াছিল, রাম তাদের বধ করলেন। রাক্ষসদের রাজা রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর ছিলেন। তিনি রামের ওপর প্রতিশোধ নেবেন ঠিক করলেন। তিনি একটা ছলে সীতাকে চুরি করে নিজের দ্বীপে নিয়ে গেলেন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাম বানর-বাহিনীর সহায়তায় রাবণের দুর্গ আক্রমণ করে রাবণকে মেরে ফেলে সীতাকে উদ্ধার করেন।

চোদ্দ বছর পার হল। রাম ও সীতা অযোধ্যায় ফিরে এলেন। রাম সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং আদর্শ রাজা হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। একদিন এক প্রজার কথা তাঁর কানে এল, সে বলছিল, "সীতা

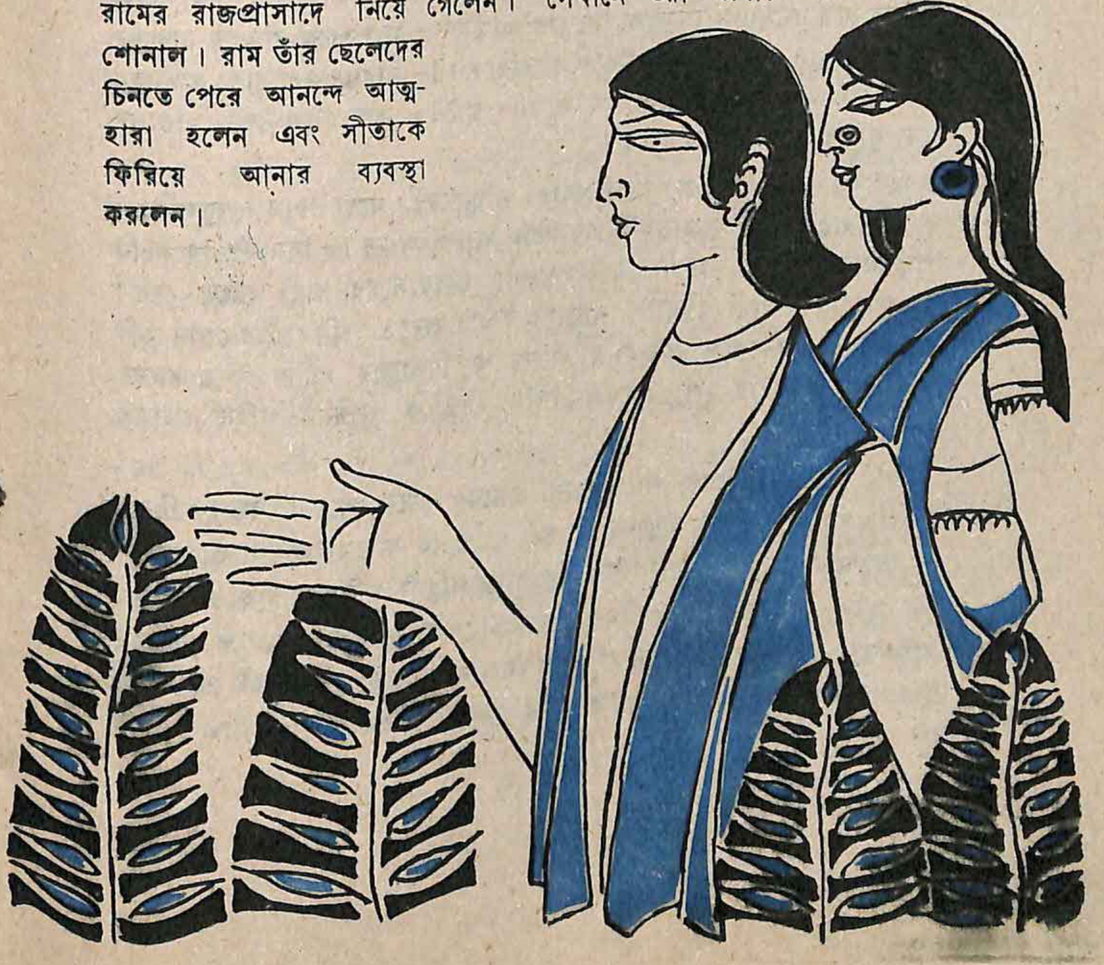


ছিল রাক্ষসের ঘরে। তাঁকে রাণী হিসেবে গ্রহণ করা কি উচিত হয়েছে?"

রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে বনে চলে গেলেন এবং বাল্মীকির আশ্রমের কাছে তাঁকে রেখে এলেন।

বাল্মীকি সীতাকে আদর করে নিজের আশ্রয় দিলেন। কিছুদিন পরে সীতার ছেলে হল, লব ও কুশ।

বাল্মীকির স্নেহে-যত্নে ছেলে দুটি যেমন ভদ্র, তেমনি বুদ্ধিমান হয়ে উঠল। সেসময় বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করছিলেন। একদিন তিনি লব কুশকে রামের রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সেখানে ওরা রামায়ণ গান গেয়ে শোনাল। রাম তাঁর ছেলেদের চিনতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হলেন এবং সীতাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন।



যখন সীতা অযোধ্যায় ফিরলেন তাঁর পবিত্রতা নিরিখ করার জন্য তাঁকে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে বলা হল। কিন্তু বাঁচার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা সীতার ছিল না। তিনি মা বসুমতীর কাছে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যদি পবিত্র হন তবে যেন মা ধরিত্রী তাঁকে কোলে তুলে নেন।

মা বসুন্ধরা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে সীতাকে তুলে নিলেন। সীতা ধরিত্রীর বক্ষের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে প্রমাণ করে গেলেন তিনি কত পবিত্র ছিলেন, এত পবিত্র যে সন্দিগ্ধমনা লোকেরা তাঁকে আপন করে পাবার যোগ্য নয়।

রামায়ণের একটা গভীর তাৎপর্য আছে। যুগ যুগ ধরে সীতা, এত সুন্দরী ও এত শান্তশিষ্ট হয়েও নীরবে শুধু দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন, দেবী বলে পূজিত হয়ে এসেছেন। সীতা 'সত্যের' প্রতীক—যে সত্যকে রামচন্দ্র রাবণের মতো অসুরের মুঠোর থেকে উদ্ধার করেছিলেন। রাবণ অসত্যের প্রতীক। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাম যুদ্ধ করেন—দুঃখের কথা, সে-সত্য মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির জন্য হারিয়ে গেছে।

বিশ্বসাহিত্যের সকল মহাকাব্যের নায়কদের মধ্যে রাম অতুলনীয়। কর্তব্যপরায়ণতা ও আজ্ঞানুবর্তিতার তিনি আদর্শ পুরুষ। বিনা দ্বিধায় তিনি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করেন এবং স্বেচ্ছায় সিংহাসনের দাবী ছেড়ে দেন। কর্তব্যপরায়ণ স্বামী হিসাবে সীতাকে উদ্ধার করতে তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। পরিশেষে প্রজাদের ধারণা ও বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে তাদের প্রতি তাঁর কর্তব্যের মূল্য দিতেই তিনি সীতাকে অগ্নিসম পবিত্র জেনেও বনবাসে পাঠান।

কিন্তু ভারতবাসীদের কাছে রাম এসবের চেয়ে অনেক বড়। বিষ্ণুর অবতারদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ভরতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তিনি দূত পাঠাননি। অন্য দিকে তিনি এক বানরবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাম চেয়েছিলেন গভীর অনুরক্তি ও পরিপূর্ণ আনুগত্য। বানরদের কোন শিক্ষাই ছিল না। তা সত্ত্বেও এই দুটি গুণের বলে তারা অনায়াসে দশানন রাবণের সুদক্ষ বাহিনীকে পরাজিত করতে

পেরেছিল। সম্ভবত বিদ্যার দশটি শাখায় ব্যুৎপত্তি ছিল বলেই রাবণের দশটি মাথা ছিল। রাবণের পরাজয় ও রামের বিজয় এই শিক্ষাই দেয় যে সবার ওপরে সত্যেরই জয়।

আজকের দিনেও শত শত যাত্রাদল ও লোকনাট্যের দল রামায়ণের আখ্যান অভিনয় করে গ্রামের দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন। চাঁদনী রাতে ভ্রাম্যমান চারণকবি রামের দুঃখ অথবা হনুমানের বীরত্বের কাহিনী গান গেয়ে শোনাচ্ছে আর চারদিকে ভিড় করে বসেছে গ্রামবাসীরা—এ দৃশ্য বিরল নয়।

রাম ছিলেন আদর্শ রাজা এবং তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা ছিল সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। তাই আজও স্বর্ণযুগ বোঝাতে লোকেরা 'রামরাজ্য' কথাটা ব্যবহার করে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় বাকবিতণ্ডার সমাধান করা হয়; সেখানেও প্রায়ই লোকেরা রামের নামে সত্য কথা বলার শপথ নেয় কারণ রাম সত্যের প্রতিমূর্তি।

প্রধান কয়েকটি ভারতীয় উৎসবের সঙ্গে রামের জীবনকথা জড়িত। বিজয়ী রামচন্দ্রের অযোধ্যায় ফিরে আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দীপাবলী আলোকোৎসব। মা দুর্গাকে নিবিষ্টচিত্তে পূজো করে রাবণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার বর রাম লাভ করেছিলেন বিজয়া দশমীর দিনে।

ভারতের নানা ভাষায় রামায়ণের অসংখ্য ভাবানুবাদ যেমন আছে তেমনি আছে কয়েকটি বিদেশী ভাষানুবাদ। পনেরো শো বছর আগে রামায়ণের চীনা সংস্করণ বেরিয়েছিল। তারপরে হয় তিব্বতী সংস্করণ। কামবোডিয়ার একটি মন্দিরের শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে চোদ্দ শ বছর আগে রামায়ণ পড়ে শোনান হত।

থাইল্যাণ্ডের লোকের উপর রামায়ণের এমন গভীর প্রভাব পড়েছিল যে, অযোধ্যার নামানুসারে ও দেশের রাজধানীর নাম রাখা হয় অযুথিয়া। কিছুমাত্র অতিরঞ্জন না করেই বলা যায় যে, ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণের কাহিনী খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। আজও ইন্দোনেশিয়ার অনেকগুলি দ্বীপে বহুল প্রচারিত যে ছায়া-নৃত্য প্রচলিত আছে তার আখ্যানভাগের অনেকটাই

রামায়ণের কাহিনী-ভিত্তিক। অনেক অনেক বছর আগে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে রামায়ণ নিয়ে যায়। সেইসব দেশের কবি ও লেখকরা স্থানীয় লোককাহিনীর সঙ্গে নিজেদের কল্পনা ও অনুভাবনা যুক্ত করে মহাকাব্যের অন্য এক রঙিন চিত্র তুলে ধরেন।

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে রামায়ণের বিশিষ্ট স্থান। আর কোনো মহাকাব্য এত বৈচিত্র্যময় সংস্করণে উদ্বুদ্ধ করেনি, আর কোনো কাহিনী স্বদেশের বাইরে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি।

মহাভারত

এক গাঁয়ে একটি ছোট্ট ছেলে একটি লোককে দেখতে পেল। লোকটা যেমন লম্বা, তেমনি মোটা, দেখতে শক্তপোক্ত আর তার ইয়া মস্ত বড় এক জোড়া গোঁফ। ছেলেটা উত্তেজিত হয়ে মার কাছে ছুটে এসে বলল, "মা, আমি ভীমকে দেখলাম।"

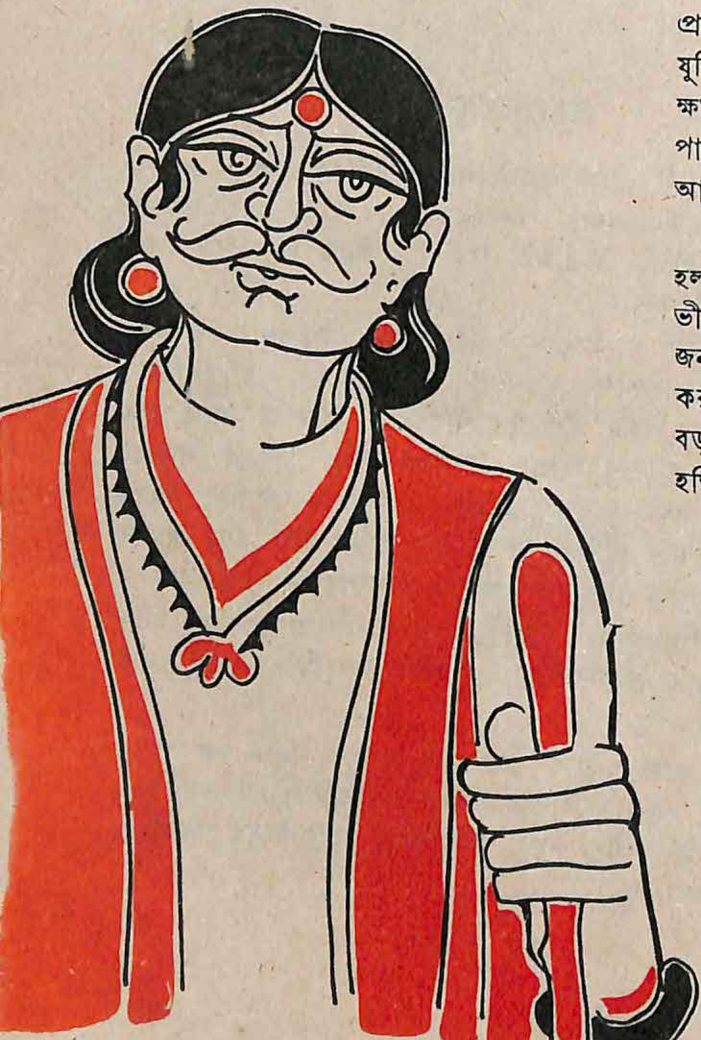
তোমরা হয়ত জান ভীম মহাভারতের বীরপুরুষদের অন্যতম। রামায়ণ, মহাভারত লেখার পর বহু শতাব্দী কেটে গেছে কিন্তু ভারতীয় ছেলেমেয়েদের কাছে এইসব মহাকাব্যের চরিত্র একেবারে জীবন্ত। শ্রীকৃষ্ণের হাতে শঙ্খ বা চক্র, অর্জুনের হাতে তাঁর বিশাল ঝকমকে ধনুক, ভয়ানক শক্তিধর ভীম, রাম শক্তিমান অথচ অন্যের দুঃখে কাতর, হনুমান অক্লেশে পাহাড় উপড়ে ফেলে তা ঘাড়ে করে আকাশপথে শত শত মাইল চলে যেতে পারেন এইসব চরিত্র সকলের কাছে প্রতিদিনের পরিচিত লোকদের মতো জীবন্ত।

মহাভারতের কাহিনী সংক্ষেপে এই ঃ হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর দুই নাতি ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। বড় জনের নাম ধৃতরাষ্ট্র ; তিনি অন্ধ ছিলেন, তাই ছোট জন সিংহাসনে বসলেন।

কিন্তু অভিশাপের ফলে পাণ্ডুকে তাঁর দুই রাণীকে নিয়ে বহু বৎসর বনবাসে কাটাতে হয়। বনবাসে থাকার সময় তার পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের নাম যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব। তপোবনের মুনিঋষিরা তাঁদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর বড় রাণী কুন্তী ছেলেদের অর্থাৎ পাণ্ডবদের নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র কৌরব নামে পরিচিত। দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা পাণ্ডবদের দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলেন। পাঁচ ভাইকে নানাভাবে ফাঁদে ফেলার জন্য ওরা অনেক রকম দুষ্ট-বুদ্ধি প্রয়োগ করলো। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার প্রসাদেই পাণ্ডবরা প্রতিহিংসার আশ্রয় নেয়নি।



ছেলেরা যখন বড় হল, সবার শ্রদ্ধেয় ভীষ্মদেব এক সন্তোষজনক সমাধান বার করলেন। কৌরবদের বড় ভাই দুর্যোধন হস্তিনাপুর থেকে অর্দ্ধেক

রাজ্যের শাসনভার পেলেন, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে রাজ্যের অন্য অর্দ্ধেকের শাসনভার পড়ল যুধিষ্ঠিরের ওপর।

কয়েক বছর বেশ শান্তিতে কেটে গেল। সবশেষে কৌরবরা একদিন পাণ্ডবদের দাবা খেলায় আমন্ত্রণ জানালেন। খেলায় পাণ্ডবরা হেরে গেলেন এবং বাজির শর্ত অনুসারে তাঁদের রাজ্য ছেড়ে তের বছরের জন্য বনবাসে যেতে হল।

তাঁরা ফিরে এলে দুর্যোধন তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে রাজি হলেন না। শান্তিপূর্ণ-ভাবে এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার সর্বরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। তখন কুরুক্ষেত্র নামে একটি জায়গায় প্রবল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে ভাই ও স্বজন হানির সম্ভাবনায় অর্জুন নিরাশ ও মর্মাহত হয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম ও সত্য রক্ষার স্বার্থে এই যুদ্ধের ন্যায়সঙ্গতি অর্জুনের কাছে ব্যাখ্যা করলেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ-ইচ্ছা ত্যাগ করতে



পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে যে ধর্মব্যাখ্যা করেছিলেন তা গীতা নামে পরিচিত। যুগ যুগ ধরে অসংখ্য জনসাধারণের কাছে গীতা আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস। যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পথ-নির্দেশক ও সারথি হয়েছিলেন।



কৌরবরা সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। যুধিষ্ঠির হলেন রাজা। কিন্তু পাণ্ডবরা বুঝতে পারলেন জাগতিক সমৃদ্ধি ও বিজয়ের কোন মূল্য নেই। তাই ছত্রিশ বৎসর ন্যায় ও সত্যের পথে রাজ্যশাসন করে তাঁরা পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়ে হিমালয়ের পথে পাড়ি দিলেন।



অজানা পথে চলতে চলতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যুধিষ্ঠিরের ভাইরা ও পত্নী একে একে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন। শুধু যুধিষ্ঠির বেঁচে রইলেন এবং স্বশরীরে স্বর্গে গেলেন। এতেই প্রমাণ হয় আধ্যাত্মিকতার চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে দেহ কোন বাধা সৃষ্টি করে না।

মহাভারতে অসংখ্য কাহিনী আছে এবং তাদের বিশেষ সার্থকতা আছে। মহাভারত জীবনের যত বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছে পৃথিবীর অন্য কোন মহাকাব্য তা করেনি। কথায় বলে, 'যা নেই মহাভারতে, তা নেই ভারতে।' তাই আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, যা নিয়ে ভারত, অন্ততঃপক্ষে অতীত ভারত ছিল, তারই সংক্ষিপ্ত রূপ এই মহাভারত।

মহামুনি ব্যাসদেব এই মহাভারত রচনা করেন। এই মহাকাব্য রচনা করার সঙ্কল্প করে তিনি এমন একজনকে চেয়েছিলেন যিনি তাঁর সৃজন-উন্মাদনায় উচ্চারিত শ্লোকগুলি লিখে যেতে পারবেন। তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশকে সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন। গণেশ একটি শর্তে রাজি হলেন। শর্তটি হল, কবি যদি বলতে বলতে কখনো থেমে যান তবে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে লেখা বন্ধ করবেন। ব্যাসদেবও পালটা এই শর্তে রাজি হলেন যে গণেশ প্রতিটি শ্লোকের অর্থ ঠিকমতো না বুঝেশুনে লিখতে পারবেন না।

এইভাবে অষ্টাদশ পর্বে মহাভারত লেখা হল ; এতে 90 হাজার শ্লোক রয়েছে।

পুরাণ

"তারপর বর্ষা এল। কালো মেঘের দল চাঁদকে ঢেকে দিল, যেমন করে মানুষের অহংভাব তার প্রকৃত সত্তাকে ঢেকে রাখে। বিধাতার করুণার মত বৃষ্টি ঝরে পড়ল—সব কিছু তখন সজীব, সতেজ ও সুন্দর।"

"তারপর এল শরৎকাল। আকাশ জল তখন ধ্যানমগ্ন চিত্তের মত স্বচ্ছ। অজ্ঞ মানুষের ভ্রান্ত ধারণার মতো রাস্তার ধুলোকাদা আস্তে আস্তে ধুয়ে মুছে গেল। যে আত্মা নিজেকে উপলব্ধি করেছে তার মত শান্ত সমুদ্র। পূর্ণ জ্ঞানের মত চাঁদ হাসছে।"

এটি ভাগবত থেকে উদ্ধৃতি; সমস্ত পুরাণের মধ্যে ভাগবতই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এখানে কবি বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ ও মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন। সমস্ত বইটি আগাগোড়া এই শৈলীতে লেখা।

বনের ভিতর থেকে দেবশিশু শ্রীকৃষ্ণের মন-মাতানো বাঁশির সুর শোনা যাচ্ছে। সবাই আত্মহারা হয়ে পরম আনন্দে এই বাঁশী শুনছে—গরু, রাখাল, গোপীরা, এমন কি যেন যমুনা নদীও। একে শুধু কবির কল্পনা বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। এর একটা অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। বাঁশীর ধ্বনি সেই দৈব আহ্বান—যে আহ্বানে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি, সমস্ত জীবজগৎ তাদের হৃদয়ের গভীরে সাড়া না দিয়ে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অনেক কাহিনী ভাগবতে বর্ণিত আছে এবং প্রত্যেকটি আখ্যানের একটা গভীর তাৎপর্য আছে। খৃষ্টের জন্মের প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে যেসব পুরাণ লেখা হয়েছিল, ভাগবত তাদের অন্যতম। কিন্তু ব্যাসদেব যে মূল পুরাণ রচনা করেন তা নিশ্চয় আরো অনেক আগের। ব্যাসদেবের রচনা থেকে নতুন চিন্তা পেয়েছেন, নতুন অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তাঁর শিষ্যরা এবং শিষ্যের শিষ্যেরা। এভাবে তাঁরা মোট ছত্রিশখানি পুরাণ রচনা করেন। এদের মধ্যে প্রধান পুরাণগুলির নাম মহাপুরাণ এবং অন্যগুলির নাম উপপুরাণ। মহাপুরাণ হল বিষ্ণু, ভাগবত, নারদ, গরুড়, পদ্ম, বরাহ, অগ্নি, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন, বায়ু, লিঙ্গ, স্কন্দ, এবং মৎস ও কূর্ম।

সংস্কৃতে পুরাণের অর্থ "সেইসব প্রাচীন আখ্যানবস্তু, যা চিরনবীন।" ('পুরাণোহপি নবম,' অর্থৎ পুরাণ যদিও প্রাচীন তবুও নতুন).

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন প্রধান দেবতাদের গুণ ও কর্মধারা নিয়েই মূলতঃ পুরাণগুলি রচিত ; এছাড়া এতে আরো অনেক কিছু পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র, পৃথিবী



নয়। এটা ভাবলে কি বিস্মিত হতে হয় না যে, পাশ্চাত্য জগৎ এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার বহু আগেই পুরাণ এ কথা বলে দিয়েছে!

কী ভাবে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কী ভাবে চলেছে এবং কয়েক যুগ পর পর কী করে পৃথিবীতে মহাপ্রলয়ে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায় এবং ধ্বংসের পর আবার নতুন সৃষ্টি শুরু হয়—পুরাণে এসব কিছুই খুব সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু পুরাণ সব সময় শুধু বড় বড় দর্শনতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়েই আলোচনা করেনি। এই যেমন, গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে নানা ওষুধের কথা এবং কী ভাবে শরীর নীরোগ ও সুস্থ রাখা যায়, সে কথা।

মহাপুরাণ ও উপপুরাণ ছাড়া পুরাণের তৃতীয় একটি শাখা আছে। তার নাম স্থলপুরাণ। এতে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব ছোট ছোট পুরাণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রাচীন ইতিহাসের সংগ্রহশালা। শত শত বছর ধরে এই সব পুরাণ হিমালয় থেকে সুদূর কন্যাকুমারিকার যাবতীয় তীর্থস্থান ঘুরে বেড়াতে মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে।



প্রকৃতপক্ষে, পুরাণের লেখকরা গোটা ভারতবর্ষকে মায়ের মতো পবিত্র বলে কল্পনা করেছেন। কালিকা পুরাণে একটা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে ঐ

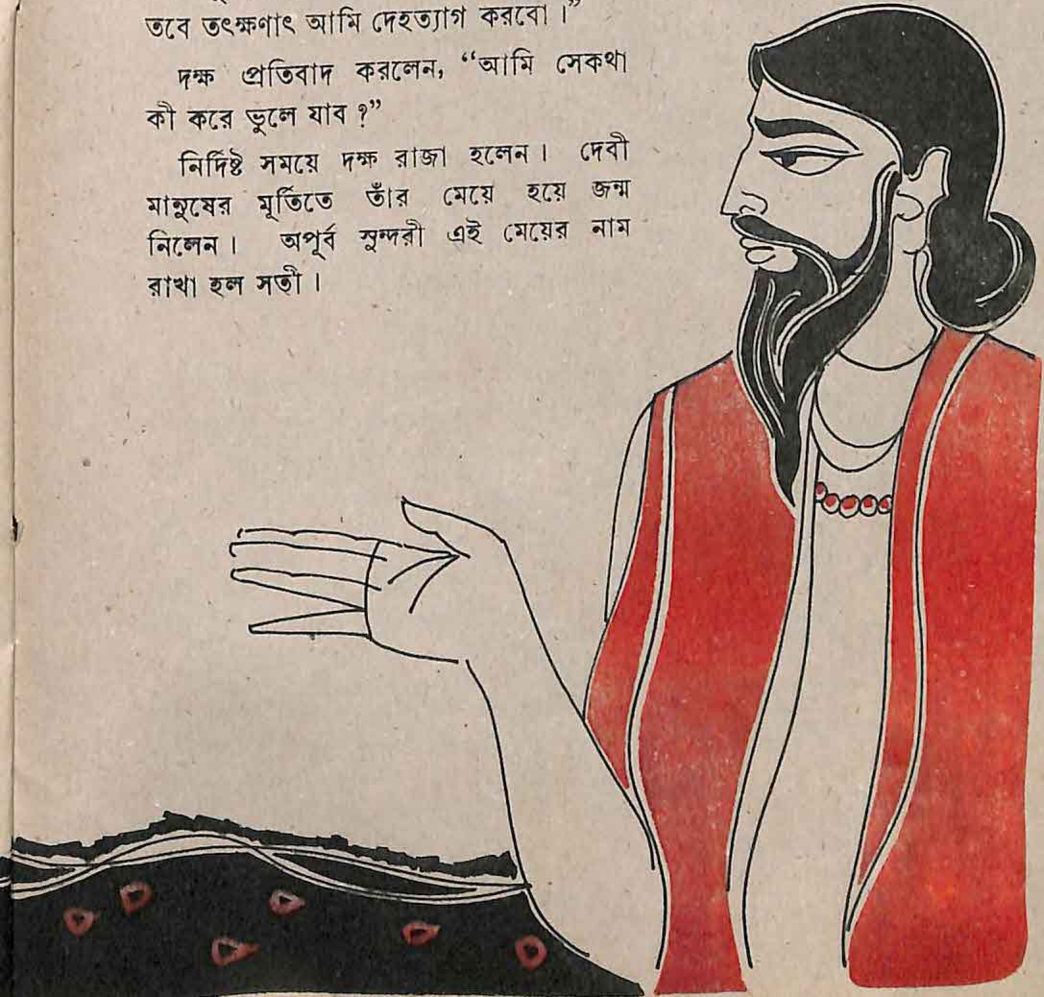
ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে। উপাখ্যানটির বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

হিমালয়ের পাদদেশে এক প্রাচীন রাজ্যে দক্ষ নামে এক যুবরাজ ছিলেন। তিনি ছিলেন দেবী মহামায়ার ভক্ত। দক্ষের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে একটি বর দিতে চাইলেন। রাজপুত্র বর চাইলেন, দেবী যেন তাঁর মেয়ে হয়ে জন্ম নেন।

দেবী সম্মত হলেন কিন্তু বললেন, "মানুষের রূপে আমি যখন জন্ম নেব, তখন তুমি যদি আমার দেবীত্ব ভুলে গিয়ে আমাকে শ্রদ্ধা করতে ভুলে যাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমি দেহত্যাগ করবো।"

দক্ষ প্রতিবাদ করলেন, "আমি সেকথা কী করে ভুলে যাব?"

নির্দিষ্ট সময়ে দক্ষ রাজা হলেন। দেবী মানুষের মূর্তিতে তাঁর মেয়ে হয়ে জন্ম নিলেন। অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়ের নাম রাখা হল সতী।



দক্ষ তাঁর মেয়েকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু মেয়ে যতই বড় হতে লাগল দক্ষ ভুলে গেলেন, এ মেয়ে শুধুমাত্র তাঁর মেয়েই নয়। দেবতাদের হস্তক্ষেপে সতীর সঙ্গে আপনভোলা শিবের বিয়ে হল। দক্ষ এতে মোটেই সুখী হলেন না।

শিব পর্বতের চূড়ায় তাঁর অনুচরদের নিয়ে থাকতেন। অনুচররা বিচিত্র সব জীব—একটা ষাঁড়, কয়েকটি সাপ আর গোটা কয়েক ভূতপ্রেত। শিবের বাড়ীঘর আস্তানা বলে কিছুই ছিল না যেখানে তিনি কাউকে আপ্যায়ন করতে পারতেন। যেখানে আত্মীয়-স্বজনই যেতে ইতস্তত করে, কোনো পিতা তেমন জায়গায় মেয়েকে রেখে কী সুখী হতে পারে? অবশ্য এ মেয়ে ও জামাই যে সাধারণ মানুষ নয়, একথা যার মনে থাকে, তার কথা আলাদা।

একদিন দক্ষের রাজপ্রাসাদে বিরাট এক উৎসব-অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। এই উৎসবে সতী ও শিব ছাড়া দক্ষ সব আত্মীয়স্বজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সতী নারদমুনির মুখে এই কথা জানতে পেরে বাপের বাড়ি যেতে চাইলেন। শিব বোঝালেন বিনা আমন্ত্রণে সেখানে যাওয়া উচিত নয়। সতী জেদ ধরলেন যাবেনই। বাবা মুখ ফুটে আমন্ত্রণ জানায়নি বলে কি মেয়ে বাপের বাড়ি যাবে না?

তখন সন্ধ্যাবেলা। দক্ষের প্রাসাদ হাজার হাজার প্রদীপে আর অজস্র ফুলে সুশোভিত করা হয়েছে। শত শত অতিথি বিরাট মণ্ডপে সমাসীন। এমন সময়ে আনন্দে উদ্ভাসিত সতী পিতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দক্ষ তাঁকে দেখে মোটেই খুশি হলেন না। সতী সাধারণ একটা পোষাক পরেছেন। দক্ষের অনেক মেয়ে, তাদের গায়ে জমকালো শাড়ী ও গলায় মহামূল্যবান অলঙ্কার। সতীর সাধারণ পোযাক দেখে দক্ষ বিব্রত বোধ করলেন। দক্ষ ভাবলেন, সতীর এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? দায়ী তাঁর খামখেয়ালী ও অন্যমনস্ক জামাই।

রাগে দিশেহারা হয়ে দক্ষ শিবের নিন্দা শুরু করলেন। সতী নিজের শত লাঞ্ছনা ও অপমান মেনে নিতে পারতেন। কিন্তু পিতার মুখে শিবনিন্দা

শুনে তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। পিতাকে তিনি বার বার নিষেধ করতে লাগলেন কিন্তু দক্ষ থামলেন না। নিদারুণ দুঃখে সতী সেখানেই প্রাণত্যাগ করলেন।

শিব এই দুর্ঘটনার কথা জানতে পারলেন। শান্তস্বভাব, আত্মমগ্ন শিব রাগে দুঃখে অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর ক্রোধ থেকে অসংখ্য ভূতপ্রেত জন্ম নিল; এরা সব চঞ্চল, সব কিছু ভেঙ্গেচুরে ধ্বংস করার জন্য উদগ্রীব। মুহূর্তের মধ্যে এরা দক্ষের রাজপ্রাসাদে গিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে উৎসব-ভূমিকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করে ফেলল।

শিব দক্ষের প্রাসাদে পৌঁছে কোনো কথা না বলে তাঁর প্রাণাধিক পত্নীর মৃতদেহের কাছে গিয়ে বসলেন। তারপর মৃতদেহটি কাঁধে তুলে শোকে নিমগ্ন শিব স্থান থেকে স্থানান্তরে হেঁটে যেতে লাগলেন।

কিন্তু কতদিন এ অবস্থা চলতে পারে? অবশেষে বিষ্ণু তাঁর অদৃশ্য 'সুদর্শন চক্র' দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কাটতে লাগলেন। যখন দেহের আর কোনো অংশ অবশিষ্ট রইল না, তখন শিব পর্বত শিখরে ফিরে গিয়ে আবার ধ্যানমগ্ন হলেন।

তিরুককুরাল

ভারতবর্ষ যে ঐতিহ্যের গর্ব করে তাতে তামিলের অবদান অসীম। পৃথিবীতে যে কয়েকটি প্রাচীন ভাষা এখনও প্রচলিত তামিল তাদের অন্যতম। বহু বছর ধরে সংস্কৃত ও তামিল ভাষা দুই বোনের মত পাশাপাশি থেকেছে।

দু'হাজার বছর আগে তামিলনাড়ুতে এক ঋষি ছিলেন। তিনি অসংখ্য ছোট কবিতা লিখেছেন। এই কবিতাগুলির গভীর অর্থ ও সেগুলির চিরন্তন সত্যে প্রকাশিত হয়ে ওঠার ক্ষমতায় ভারতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে তা অতুলনীয় সম্পদ হয়ে আছে। গ্রন্থটি তিরুককুরাল বা কুরাল নামে পরিচিত। 'তিরু'-র অর্থ পবিত্র আর 'কুরাল' মানে ছোট কবিতা। গ্রন্থটিতে 133 অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দশটি শ্লোক আছে।

যে ঋষি এই কবিতা রচনা করেছেন তাঁর নাম তিরুভালুবর। অতীতের অনেক মহান্ পুরুষের মতই তিনিও তাঁর জীবনের কথা কিছুই লিখে যাননি। তাঁর আসল নাম পর্যন্ত জানা যায় না, কারণ 'তিরুভালুবর' কথার অর্থ 'ভালুবা জাতের একজন ভক্ত'। ভালুবারা ছিল রাজার ঘোষক; তারা হাতীর পিঠে চড়ে ঢোল বাজিয়ে রাজার আদেশ বা আইনের অনুশাসনের কথা ঘোষণা করত। মনে হয় তিরুভালুবর অন্য জীবিকা বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বর্তমান মাদ্রাজ শহরের একটি অংশ মাইলাপুরে তন্তুবায়ের কাজ করতেন। কিন্তু তিনি যে তাঁতী ছিলেন এ কথাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে তিনি অতি সুন্দর কাব্য রচনা করেছেন বলে অতীতে কেউ হয়তো সেই অর্থে তাঁকে তাঁতী বলেছেন!

এই ঋষির বিষয়ে বহু চমৎকার কাহিনী প্রচলিত আছে। কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে লোকেরা তাঁর কাছে উপদেশ নিতে যেত। যখনই সম্ভব হত ঋষি কথা না বলে রূপকের ছলে বা উদাহরণ দিয়ে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন।

একদিন সকালে এক যুবক তার সমস্যা নিয়ে ত াঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির। সে জিজ্ঞেস করল, "বলুন তো, বউ থাকা ভাল কিংবা না থাকা ভাল।"

ঋষি মৃদু হেসে যুবকটিকে তাঁর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাতে বললেন। তাঁরা দু'জনে প্রাতঃভোজন করতে বসলে ঋষি-পত্নী তাঁদের সামনে ভাত এনে



রাখলেন। আগের রাত্রে রান্না ভাত, তাই একেবারে ঠাণ্ডা। কিন্তু ঋষি খেতে বসেই চিৎকার করে উঠলেন, "বাসুকি, ভাত এত গরম কেন ?"

কোনো কথা না বলে ঋষির পত্নী বাকি ভাতের থালার পাশে বসে হাওয়া করে ভাত ঠাণ্ডা করতে লাগলেন।

তারপর দুপুরে খাওয়ার সময় অর্দ্ধেক খাওয়া শেষ করে ঋষি আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাসুকি, কী ব্যাপার বলতো ? এখন অর্দ্ধরাত্রি আর তুমি এখানে একটা আলো পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখনি !"

এবারও কোনো তর্ক না করে বাসুকি একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে ঋষির কাছে রাখলেন।

যুবকটি সবিনয়ে বলল, "মহাশয়, আমার প্রশ্নের আপনি জবাব দিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী থাকা, না-থাকার চেয়ে আপনার মত স্বামীর অনুরক্তা ও অনুগতা স্ত্রী নিশ্চয় অনেক ভাল।"

তিরুভালুবর রাজার অধীনে চাকরী গ্রহণ করেননি কিন্তু পরবর্তী যুগে তাঁকে সবাই জ্ঞানী-পণ্ডিতদের রাজা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, নানা অবস্থায় মানুষ যেসব সমস্যায় পড়ে, কুরালে তার বিষয়ে সুন্দর ও বাস্তব কয়েকটি উপদেশ দেওয়া আছে।

শুধুমাত্র মানুষের নৈতিক জীবন সম্বন্ধেই তিরুকুরালের উপদেশ আবদ্ধ নয়। কূটনীতি, রাজত্ব চালাবার কৌশল এবং মানুষের অন্যান্য ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে এতে উপদেশ রয়েছে।

কথাসরিৎসাগর

পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্প-সংগ্রহ কথাসরিৎসাগর। একটা গল্প বলতে গিয়ে এতে আর একটি গল্প এসেছে—তার মধ্যে আর একটি—রাজা, দৈত্যদানবের শত শত গল্প, চতুর যুবক, সুন্দরী মেয়েদের কথা, বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারী, সরল বোকার দল—সব এতে আছে। এতে সেইসব জন্তুজানোয়ারের কথা আছে যারা দিব্যি কথা বলতে পারে, আরো আছে ইন্দ্রজালের পাহাড়, মায়া দুর্গ, দুঃসাহসী অভিযাত্রী।

কারা এসব গল্প লিখেছে, এবং কখন? সুদূর অতীতে কয়েক হাজার বছর আগেও এইসব গল্পের কয়েকটি সম্ভবত একটু অন্যরকম ভাবে বলা হত এমন নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কয়েকটি গল্প হয়তো কাশ্মীর উপত্যকায় ঝিলম নদীর কূলে কোন এক ঝড়ের সন্ধ্যায় গ্রাম্য শ্রোতাদের কাছে বলা হয়েছিল। কোনো কোনো গল্প এসেছে সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে; হয়তো কন্যাকুমারীতে কোন এক গরমের দিনে একটি জেলে নৌকার ছায়ায় অলসভাবে বসে সমবেত বালকদের গল্প শুনিয়েছিল, সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতের সকল প্রান্ত থেকে—আসা শত শত গল্প এই কথাসরিৎসাগরে স্থান পেয়েছে। কারণ কথাসরিৎসাগর নামের অর্থই হল, "গল্পের নদীধারাগুলি মিলে যে সাগরের সৃষ্টি"! বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে নদীগুলি সাগরে এসে পড়ে। যিনি এই গল্পগুলি সংকলন করেন, তিনিও ভালোভাবেই জানতেন এই গল্পগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে।

প্রায় এক হাজার বছর আগে কাশ্মীরবাসী সোমদেব এই সংকলন করেন। কিন্তু যে-বই থেকে তিনি বেশীর ভাগ গল্প সংগ্রহ করেন, তার কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। শুধু এটুকু আমরা জানতে পেরেছি যে, বইটির নাম ছিল 'বৃহৎকথা।'

বৃহৎকথা লিখেছিলো গুণাঢ্য ; লেখা হয়েছিল পৈশাচী ভাষায়। বহুদিন আগেই সেই ভাষার মৃত্যু ঘটেছে। কথিত আছে গুণাঢ্য ছন্দে এই গল্পগুলি লিখে তাঁর গুণগ্রাহী রাজা সাতবাহনকে সেগুলি পড়ে শোনান। সাতবাহন এতে কোনো উৎসাহ প্রকাশ না করায় গুণাঢ্য রাগে ও দুঃখে পাণ্ডুলিপির পাতার পর পাতা ছিঁড়ে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। সাতবাহন নিজের ভুল বুঝতে পেরে গুণাঢ্যকে গোটা পাণ্ডুলিপি নষ্ট করতে দেন নি। কিন্তু ততদিনে পাণ্ডুলিপির চার ভাগের তিন ভাগ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সোমদেব সংস্কৃতে অনুবাদ করার বহুপূর্বেই অনেকগুলি গল্প ভারতের উপকূল ছাড়িয়ে বিভিন্ন দূর দেশের দরবারে পৌঁছেছিল। কিছু কিছু গল্প একটু অন্য রকম ভাবে আমরা আরব্যোপন্যাসে দেখতে পাই।

কথাসরিৎসাগরের গল্পগুলি যে একজন মাত্র মানুষের কল্পনাপ্রসূত নয়, তা খুবই স্পষ্ট। দেশের নানা প্রান্তের অজানা গল্পকারের রচনা এতে গাঁথা হয়েছে। হয়তো তাঁরা খুব শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু মানব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। আমরা দেখতে পাই গল্পকাররা ভণ্ডদের নিদারুণভাবে ফাঁস করে দিচ্ছেন ; অসহায় মানুষের দুঃখ কষ্ট ফোটাতে তাঁরা কত গভীরভাবে সহানুভূতিশীল এবং জগতের চলতি ধারার পরিচয় দেবার সময় মন্তব্যে কত সুনিপুণ বাস্তববাদী।

অবশ্য গল্পকাররা দুষ্টের শাস্তি আর পুণ্যবানের পুরস্কার লাভ বর্ণনায় রীতিমত সিদ্ধহস্ত। সেই জাতীয় একটা গল্প বলছি।

একদা কোনো একটি মন্দিরে একটি শঠ ভিখারী বাস করত। সে এমন

ছল করল যেন মৌন ব্রত পালন করছে। বহু লোক তার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জানাতে এল। এরকম অবস্থায় যেমন হয়ে থাকে, তারা নিয়ে এল মূল্যবান উপহার, খাবার, কাপড় ও অর্থ। এইসব উপহারের বড় অংশটা নিজের জন্যে রেখে বাকিটা ভিখারী নির্বোধ লোকগুলোর মধ্যে বিলিয়ে দিত। এরা নিজেদেরকে ভিখারীর ভক্ত-অনুচর বলত।

একদিন এক ধনী সদাগর তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে প্রণাম জানাতে এল। সে মেয়েটি পরমা সুন্দরী। প্রবঞ্চক সাধু মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইল। সে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব অনায়াসে করতে পারত, কারণ তখনকার দিনে ধনী লোকেরা গরীব সৎ লোকের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিতে ইতস্তত করতেন না। কিন্তু এই সাধু খুবই কুটিল ছিল, তাই একটা ষড়যন্ত্র করল। সে সদাগরকে পাশে ডেকে নিয়ে বলল, "আপনি জানেন আমি মৌন ব্রত পালন করছি। আপনার মঙ্গল চাই বলেই আমি কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। আপনার মেয়ের সম্বন্ধেই একটা কথা বলব। মেয়েটি খুবই দুর্ভাগা। যদি আপনি একে সঙ্গে রাখেন আপনার অমঙ্গল হবে।"

গভীর উৎকণ্ঠায় সদাগর বলল, "আমি তবে কী করব ?"

ভিখারী বলল, "খুবই সহজ। একটা ঝাঁপিতে মেয়েটিকে ভরে আজ রাতে নদীর জলে ভাসিয়ে দিন। ঝাঁপির ওপর একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন।"

সদাগর বলল, "সেই ভাল।"

তখনও রাত্রি গভীর হয়নি। এক রাজকুমার মৃগয়া করে ফিরবার পথে নদী পার হচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন একটি ঝাঁপির ওপর একটি প্রদীপ জ্বলছে। তিনি সেটাকে নৌকোয় তুললেন। খুলে বিস্মিত হয়ে দেখেন ভিতরে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে কাঁদছে।

রাজকুমার বন থেকে একটা হিংস্র বাঁদর ধরে এনেছিলেন। তিনি সেটাকে ঝাঁপির ভেতরে পুরে, তার ওপর প্রদীপটা রেখে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।

মন্দিরের কাছে নদীর তীরে ভিখারী ঝাঁপি ও প্রদীপের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে ছিল। যেই সে ঝাঁপিটা দেখতে পেল অমনি তার শিষ্যদের সাঁতরে ওটাকে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিল। ঝাঁপিটাকে তার ঘরে রাখা হল। সে শিষ্যদের চলে যেতে বলল এবং অধীর আগ্রহে ঝাঁপির ডালাটা খুলল।

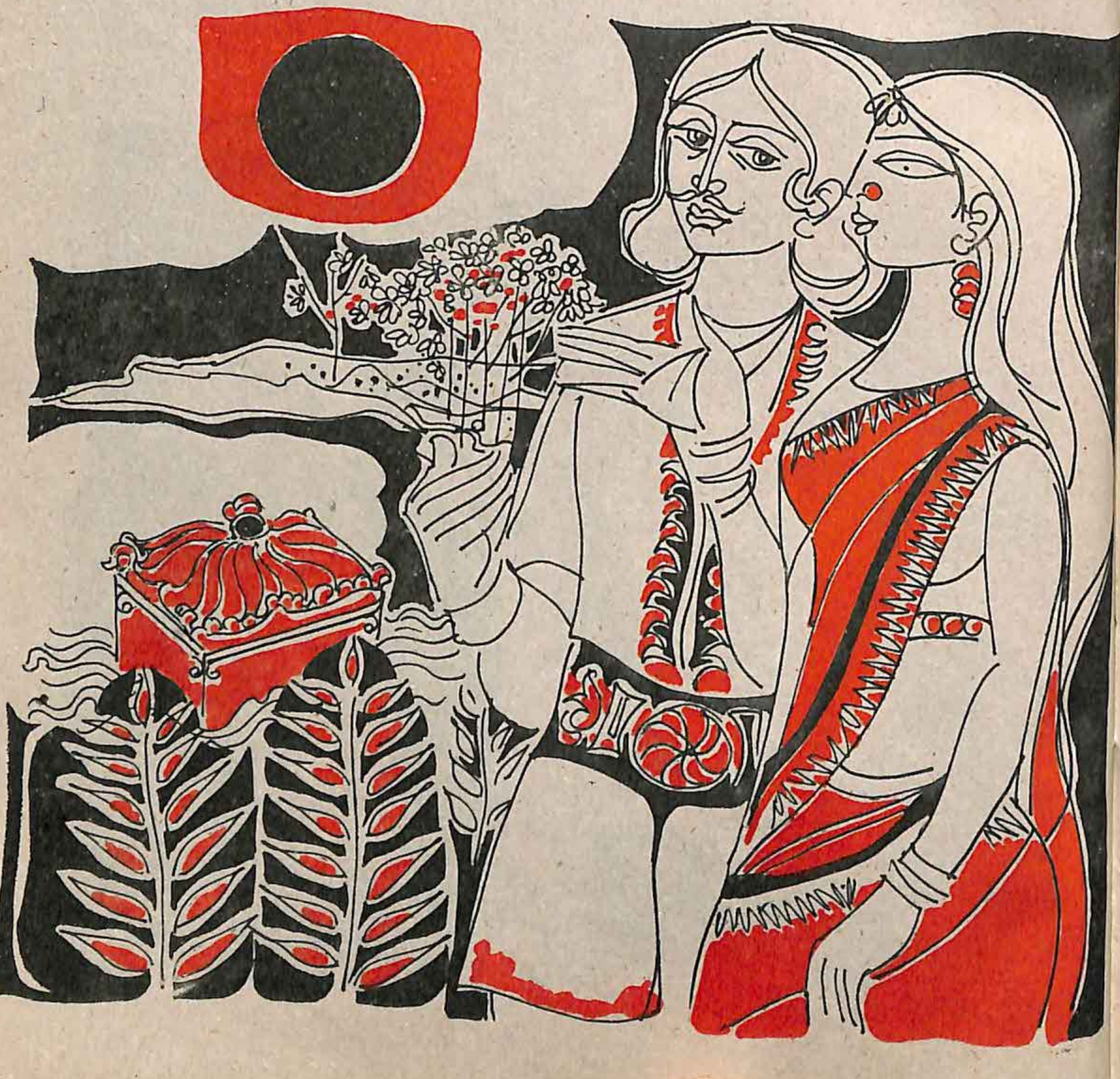
ভিখারী কিছু বুঝবার আগেই তার নাকের অংশটা উড়ে গেল। তারপরে কান।



ভিখারী পাগলের মত ভয়ে চিৎকার করে উঠে দৌড়তে থাকল। তারপর তাকে আর কেউ দেখতে পায়নি। এত অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে একটা অত্যন্ত হিংস্র বাঁদরে কী করে রূপান্তরিত হল, ভিখারী সেটা ভেবে নিশ্চয় খুব বিস্মিত হয়েছিল।



বলা বাহুল্য এরপর রাজকুমার মেয়েটিকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।



পঞ্চতন্ত্র

প্রাচীনকালে কোনো এক রাজার তিনটি ছেলে ছিল। রাজকুমারদের পড়াশোনায় একেবারে মন ছিল না। শুয়ে-বসে দিন কাটিয়ে দিত। রাজা দেখে খুব কষ্ট পেতেন। তিনি জানতেন, রাজকুমাররা যদি এভাবে সময় নষ্ট করে তবে কেউ সিংহাসনের যোগ্য হয়ে উঠবে না।

রাজা একজনের পর আরেকজন শিক্ষক নিযুক্ত করলেন কিন্তু সবই বৃথা। শিক্ষককে দেখেই রাজকুমাররা ভয়ে পালিয়ে যেত।

সময় কেটে যেতে লাগল ; রাজা যেন দিন দিন হতাশ হয়ে পড়লেন।

পরিশেষে তিনি রাজ্যের সব পণ্ডিতদের এক সভা ডাকলেন এবং তাঁর সমস্যার কথা তাঁদের জানালেন। তিনি জানতে চাইলেন, "আপনাদের মধ্যে কেউ কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন ?"

অনেকক্ষণ কেউ কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে একজন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "হে রাজন, আপনার ছেলেদের শিক্ষার ভার যদি আমার হাতে দেন, তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

এই পণ্ডিতের নাম বিষ্ণুশর্মা। সমগ্র রাজ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। এরকম একজন মানুষ তাঁর ছেলেদের শিক্ষার ভার নিতে চাইছেন দেখে রাজা খুবই খুশি হলেন।

রাজার বিরাট রাজপ্রাসাদ। তার চারপাশে লম্বা লম্বা গাছ। তার ছায়া

এসে পড়ে মস্ত ছাদের একদিকে। বিষ্ণুশর্মা নির্জন ছাদের এক কোণে রাজকুমারদের নিয়ে গেলেন। তিনি তাদের সামনে বসতে বললেন।

রাজকুমাররা মোটেই খুশি হল না, কারণ পড়ার নামেই তাদের গায়ে জ্বর আসে। শীঘ্রিরই কিন্তু দেখা গেল তাদের উঠবার কোনো ইচ্ছে নেই। বিষ্ণুশর্মার পড়ানোর কায়দা ছিল একেবারে অন্য ধরণের। তিনি বলতে শুরু করলেন, "গোদাবরী নদীর ধারে একটা বিশাল গাছ ছিল। প্রতিদিন রাতে নানা জায়গা থেকে পাখিরা এসে এই গাছে আশ্রয় নিত..."

এভাবে তিনি গল্পের পর গল্প বলে যেতে লাগলেন। বললেন, পাখির কথা, জীবজন্তুর কথা। এমন সব গল্প বলে যেতে লাগলেন যা আমাদেরই কথা,



মানুষের নানা রকম সমস্যা ও তাদের সমাধানের কথা। আদর্শ বন্ধু কে? বন্ধুত্ব কী করে বজায় রাখা যায়? যে লোভ মানুষকে শেষ করে দেয় সে লোভ থেকে বাঁচার উপায় কী? এই গল্পগুলি আমাদের শেখায় যে, ভালো হলে তার সুফল পাওয়া যায়; কিন্তু শুধু ভালো হলেই হবে না, সাবধানী, চালাক-চতুর, ও উচ্চমনা হতে হবে।

বিষ্ণুশর্মার কাছে শিক্ষা পেয়ে রাজকুমারদের সুবুদ্ধি হল এবং তারা বিচক্ষণ হয়ে উঠল।

পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলি বারবার বলা হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস তোমরাও অনেকগুলো গল্প পড়েছ। কতগুলি গল্প অতটা জনপ্রিয় নয় বটে কিন্তু ওতেই



রত্ন ছড়িয়ে আছে। যেমন 'মুখর গুহা'-র গল্প। গল্পটা খুব মজার কিন্তু শিক্ষার ছলে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেককে সবসময় সাবধানে থাকতে হবে।

অনেকদিন আগের কথা। এক বনে একটা শেয়াল ছিল। সে একটা নির্জন গুহায় থাকত। একদিন ও বাইরে গিয়েছে এমন সময় একটা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত সিংহ গুহার দিকে এল। গুহার ভেতরে ঢুকে সিংহটা চারদিকে গন্ধ শুঁকতে লাগল। ভাবল নিশ্চয় এখানে একটা শেয়াল থাকে। খাদ্যের সন্ধানে আমি অযথা এদিক-ওদিকে ঘুরে মরি কেন? এখানে শুয়ে বিশ্রাম করি। শেয়ালটা ফিরলে রসাল খাবার জুটবে।

অপরাহ্নে শেয়ালটা গুহায় ফিরে এল। কিন্তু গুহায় ঢোকায় আগে সিংহের অস্পষ্ট পায়ের ছাপ তার নজরে পড়ল। তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। মনে সাহস এনে সে চিৎকার করে বলল, "কী ব্যাপার গুহা, তুমি কথা বলছ না কেন? তোমার কী হল? প্রতিদিন আমি যখন ফিরি তুমি আমাকে একথা বলে অভ্যর্থনা কর, 'আসুন, শেয়াল মশায়।' কিন্তু আজ তুমি এত চুপচাপ কেন? আমি কী ধরে নেব তুমি চাওনা আমি ভেতরে আসি?"

সিংহটা মনে মনে ভাবল: আমি ভেতরে আছি বলে নিশ্চয় গুহাটা ভয় পেয়েছে। তাই বোধ হয় গুহাটা শেয়ালকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না!

তাই সে গর্জন করে উঠল, "শেয়াল মশায়, আসতে আজ্ঞা হোক। আসুন, আসুন।"

শেয়ালটা প্রাণ ভয়ে দৌড় দিল। যেতে যেতে চিৎকার করে বলল, "ওহে গুহা, তুমি আমার খুবই প্রিয় কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাব বলেই ঠিক করলাম।"

শেয়ালটা বাঁকা হাসি হেসে নিজের মনেই বলল: "অ্যাঁ, গুহা কথা বলে জন্মে শুনিনি! ভগবানের দয়ায় এ যাত্রায় খুব বাঁচা বেঁচে গেলাম!"

জাতক

বর্তমান যুগে যেসব ধর্মের বহুল প্রচার বৌদ্ধধর্ম তাদের অন্যতম। যদিও ভারতে খুব বেশী বৌদ্ধ নেই তবুও প্রত্যেক ভারতীয় বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু জানে। তিনি ছিলেন রাজপুত্র এবং তখন তাঁর নাম ছিল গৌতম। ধনদৌলত ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে তিনি বনে তপস্যা করতে গেলেন। দুঃখকে জয় করার জন্যই এই তপস্যা। কিন্তু লোককাহিনীতে বলা হয় গৌতমরূপে জন্ম নেবার আগে জন্তু ও মানুষের নানা বিভিন্ন রূপে তিনি শত শত বার জন্ম নিয়েছিলেন। প্রত্যেক জন্মে তিনি মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং পরিশেষে বুদ্ধ জন্মে সেইসব অভিজ্ঞতার কথা শিষ্যদের বলেছিলেন।

এইসব কাহিনীর নাম জাতক কাহিনী। বুদ্ধ নিজে কতগুলি গল্প বলেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর উৎসাহী শিষ্যরাই-বা কত কাহিনী যোগ করেছেন তা বলা শক্ত।

মোট 457টি জাতক কাহিনী আছে। 'জাতক' শব্দটির স্থূল অর্থ, 'জন্ম'। প্রত্যেক জন্ম নিয়ে এক বা একাধিক কাহিনী রয়েছে।

প্রত্যেক গল্পের একটি শিক্ষামূলক উপদেশ রয়েছে। এইসব গল্প জীবনকে আরও ভালোভাবে বুঝতে শেখায়, ভালোভাবে জীবন ধারণ করতে শেখায়। কারণ এতে আত্মম্ভরিতার অসার্থকতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে, দেখান হয়েছে লোভ ও পাপ মানুষের দুঃখকষ্টের মূল কারণ।

এই যেমন সেই মেকি সাধুর কথাই ধরা যাক। তার গেরুয়া বসন আর লম্বা দাড়ি দেখে লোকেরা তার পায়ে পড়ে প্রণাম করে। এতে সাধুর গর্ব এসে যায়; তার ধারণা হয়ে যায় যে লোকেদের ভক্তিশ্রদ্ধা পাওয়া তার প্রাপ্য।

একদিন সে একটা গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে ভেড়ার লড়াই দেখতে গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে। সাধু ওখানে গিয়ে একটা পাথর-খণ্ডের ওপর বসে প্রথমে গলা খাঁকারি দিল। তাতেও লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে জোরে জোরে কাশতে লাগল।

দুর্ভাগ্যবশত লোকেরা তাকে দেখতে পাবার আগে একটি ভেড়া তাকে দেখল। কী কারণে তা জন্তুটাই জানে, সাধুর দৃষ্টিটা তার মোটেই পছন্দ হল না এবং তাকে ঢুঁ মারবে ঠিক করল।

মাথাটা নীচু করে গুঁতো দেওয়াই ভেড়ার স্বভাব। ভেড়াটাকে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখে সাধু ভাবল ভেড়াটা ওকে প্রণাম জানাতে আসছে এবং খুব খুশি হল। লোকেরা চিৎকার করে তাকে সরে যেতে বলল কিন্তু সাধু শুনল না। বরং সে হাত তুলে ভেড়াটাকে আশীর্বাদ করতে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ভেড়াটা তাকে গুঁতো দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

লোভের যে কী ভয়াবহ পরিণতি তা অন্য একটি গল্পে আরও ফুটে উঠেছে।

একবার এক তরুণ যাযাবর এক অশিক্ষিত গ্রামবাসীর সাক্ষাৎ পেল। সে নানা রকম অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ জানত। প্রত্যেক দিন লোকটি একটা বনে যেত, একটি আম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটি মন্ত্র আওড়াত। সঙ্গে সঙ্গে গাছটা ফলের ভারে ঝুলে পড়ত। পর মুহূর্তে আমগুলো পেকে মাটিতে ঝরে পড়ত। লোকটা সেইসব আম কুড়িয়ে নিয়ে এসে খেত এবং গরীব প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করত।

যদিও গ্রামবাসী ছিল নীচু জাতের লোক, যুবক তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। অনুনয় করতে লাগল, এ মন্ত্রটা তাকে শিখিয়ে দিতে হবে। লোকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হল কিন্তু সাবধান করে দিয়ে বলল, "নিজের লোভ



মেটাতে তুমি কখনও এই মন্ত্র ব্যবহার কোর না। তাছাড়া যতদিন তুমি মিথ্যে কথা না বলো, ততদিন মন্ত্র কাজ করবে।"

যুবক তার নিজের গ্রামে ফিরে এসে প্রতিদিন বেশ ক'বার মন্ত্রটি আওড়াত আর প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু আম সংগ্রহ করত। এগুলি সে বাজারে বেচে কয়েক মাসের মধ্যে বড়লোক হয়ে গেল।

রাজা এই অলৌকিক ঘটনার কথা জানতে পারলেন। তিনি যুবককে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় তুমি এ মন্ত্র শিখেছ ?"

অহঙ্কারী তরুণ নীচু জাতের একজন মানুষের কাছে এ মন্ত্র শিখেছে তা স্বীকার করতে লজ্জা পেল। তাই বলল, "হে রাজন্‌, বহু দূরের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতদের কাছে বহুদিন অধ্যয়ন করে এই মন্ত্র শিখেছি।"

রাজা আদেশ দিলেন, "বেশ, তবে আমাদের সামনে অলৌকিক শক্তি দেখাও।"

রাজপ্রাসাদের ফলের বাগানে তরুণের পেছনে পেছনে চললেন রাজা, তাঁর পরিবারবর্গ, মন্ত্রী মহোদয়রা এবং পদস্থ কর্মচারীরা। যুবক একটা বড় আম গাছ বেছে নিয়ে মন্ত্রটি উচ্চারণ করল। কিন্তু একটা মিথ্যে কথা বলেছিল বলে কিছুই ঘটল না।

খুব অপমানিত হয়ে যুবক রাজার কাছে সত্য কথাটা বলল। রাজা বললেন, "দম্ভে আত্মহারা হয়ে তুমি তোমার শিক্ষকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছ। যাও, তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। তাহলে হয়তো মন্ত্রটি আবার কাজ করতে পারে।"

যুবক তাই করল। কিন্তু নিজের লোভ মেটাতে মন্ত্রের অপব্যবহার করেছে বলে মন্ত্র আর কাজ করল না।

এরকম ধরণের অনেক নৈতিক উপদেশে জাতকের কাহিনীগুলি সমৃদ্ধ।

অর্থশাস্ত্রম্

উঁচু বংশের এক তরুণ রাজ্যের রাজার কাছে খুব অপমানিত হয়েছিল। একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল, ভাবছিল কী করে প্রতিশোধ নেওয়া যায়। একটা অদ্ভুত দৃশ্য সে দেখতে পেল। এক ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ কয়েকটি কাঁটা গাছের গোড়াতে কিসের যেন রস ঢালছে।

যুবকটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি এ কী করছ ?"

"এ গাছের একটা কাঁটা আমার পায়ে ফুটেছে। আমি এইসব কাঁটা গাছ নির্মূল করতে চাই। আমি গাছের গোড়ায় চিনির রস ঢালছি। এক্ষুণি লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে এসে গাছগুলোকে ছেঁকে ধরবে। তারা গাছের শেকড় খেয়ে ফেলবে এবং গাছগুলি অচিরেই মরে যাবে।"

বৃদ্ধের বুদ্ধি ও দৃঢ়সঙ্কল্প দেখে যুবক অবাক হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে এই মানুষটিই তাকে ভাল পরামর্শ দিতে পারবে।

যুবকের নাম চন্দ্রগুপ্ত। বৃদ্ধের নাম চাণক্য। যুবক বৃদ্ধকে তার উপদেষ্টা হতে অনুরোধ করল। বৃদ্ধ রাজি হলেন, কারণ রাজার বিরুদ্ধে তাঁরও বড় রকমের একটা অভিযোগ ছিল।

চাণক্যের পরিচালনার গুণে চন্দ্রগুপ্ত শীঘ্রই মগধের রাজা নন্দকে গদিচ্যুত করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনিই মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকারের গল্পটি হয়তো সত্য নয়।

তবে এই গল্পের জনপ্রিয়তা দেখে বোঝা যায় চাণক্যকে লোকে কী চোখে দেখত। লোকেরা তাঁকে ধূর্ত ও ক্রোধী বলে জানত। তারা ভাবত লক্ষ্যে কী করে পৌঁছতে হয় চাণক্য তা ভালোরকম জানেন।

চাণক্য কৌটিল্য নামেও পরিচিত। বহু লোকের বিশ্বাস যে, কৌটিল্যের অর্থ 'কূটনীতিক'। কিন্তু সম্ভবত মূল শব্দটি কৌটল্য, কৌটিল্য নয়। কৌটল্য এক প্রাচীন ঋষির নাম, যিনি সম্ভবত চাণক্যের বংশের আদিপুরুষ।

চাণক্য একখানি বই লেখেন ; তিনি যে ধূর্ত ও ক্রোধপ্রবণ মানুষ, এই বই থেকেই লোকের সে ধারণা হয়। গ্রন্থটির নাম অর্থশাস্ত্রম্। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেসব বই নিয়ে আলোচনা করেছি এ বইটি তার থেকে একেবারে আলাদা ধরণের। প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতরা শুধু যে অধ্যাত্মবাদ, দর্শন, গল্প ও কবিতা নিয়েই আবদ্ধ থাকতেন না, এই গ্রন্থটি সেটাই প্রমাণ করে। জীবনের সব দিক নিয়েই তাঁরা আলোচনা করেছেন। পুরাণের যুগে অর্থশাস্ত্রম্ লেখা হয়। এটা রাজনীতি, সমাজনীতি, আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ।

এইসব বিষয়ে আদি পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা যেসব নীতি ও সূত্র লিখে গেছেন, চাণক্য সেই সবগুলি গভীরভাবে অনুশীলন করেন। তিনি জানতেন যে, রাজা ও রাজকর্মচারীরা এসব পড়ার কষ্ট স্বীকার করবেন না আর উপকৃতও হবেন না। তাই তিনি বইয়ে বিশেষজ্ঞদের বর্ণিত বা লিখিত সব নীতি ও সূত্রের সংক্ষিপ্তসার তুলে দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে নিজের মতামতও যুক্ত করেছেন।

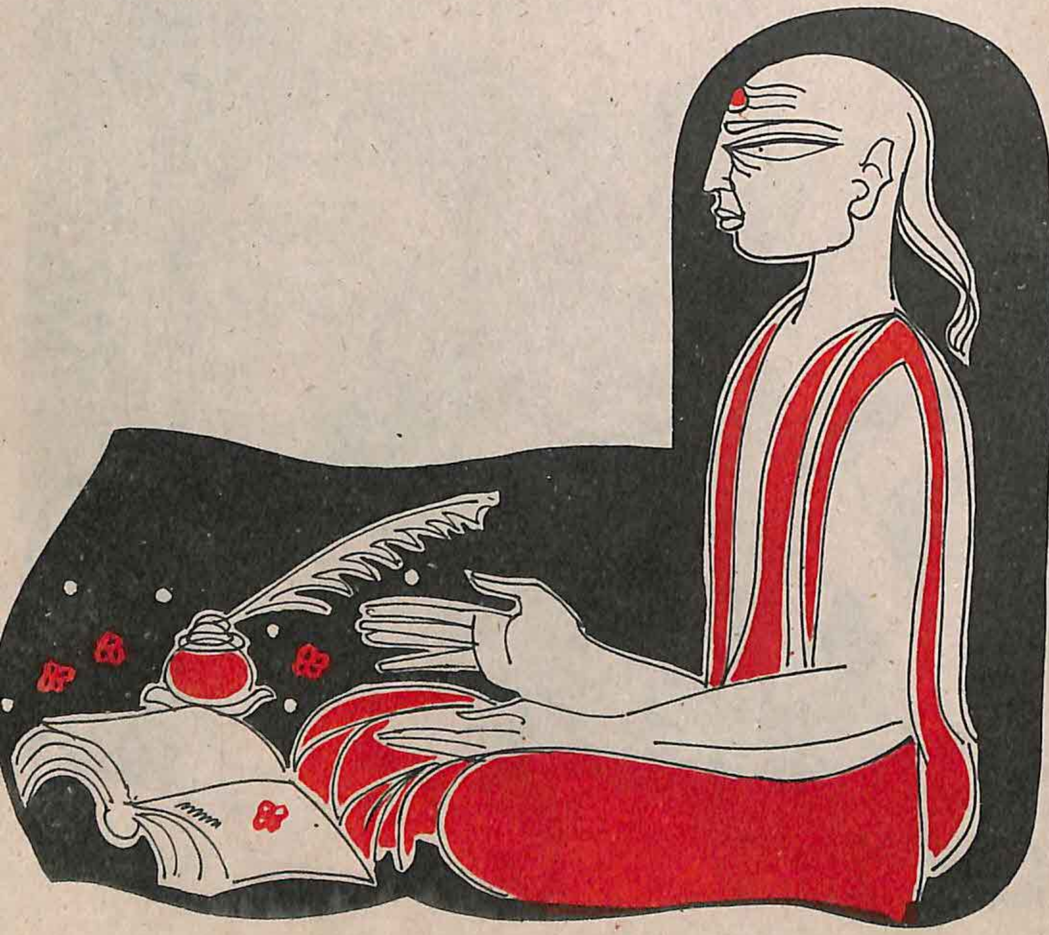
চাণক্য ছলে-বলে-কৌশলে শত্রুকে পরাজিত করার কথা বলেছেন। তাই অনেক সমালোচকের মতে তিনি খুবই হৃদয়হীন ও শয়তান। রাজা, কূটনীতিবিদ এবং শাসকবর্গের জন্যই তিনি এই বই লিখেছেন। তখনকার দিনে এক রাজা অন্যকে জব্দ করতে প্রায়ই ছলকলার আশ্রয় নিতেন। চাণক্য শুধু এটাই বলেছেন যে, কোন্ অবস্থায় শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া উচিত এবং কোন্ অবস্থায় নয়।

রাজ্যশাসনের পক্ষে অনুপযুক্ত অনেক রীতিনীতি চাণক্য বাতিল করেছেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তখনকার দিনে রাজপুত্ররা প্রায়ই পিতাকে হত্যা করে রাজা হতে চাইত। আগেকার উপদেষ্টারা এইসব রীতি-রেওয়াজ বন্ধ করার জন্য রাজাকে পরামর্শ দেন। কেউ কেউ মনে করতেন যে, রাজপুত্রদের রাজধানী থেকে অনেক দূরে দুর্গে বন্দী রাখাই শ্রেয়। কেউ-বা পরামর্শ দিতেন যে, রাজা এমন হওয়া উচিত যাতে কিনা রাজপুত্রেরা তাঁকে যমের



মতো ভয় করে। চাণক্য এঁদের যুক্তি সবই তাঁর বইতে উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, এইসব পদ্ধতি অযৌক্তিক। এই সমস্যার সবচেয়ে ভাল সমাধান হল এই যে, ভাল ও সুদক্ষ শিক্ষকের নির্দেশে রাজপুত্রদের মানুষ করতে হবে।

তাই অর্থশাস্ত্রম্ বাস্তব উপদেশ ও সুস্থ বিচার-বুদ্ধির অনন্য এক গ্রন্থ।





National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00